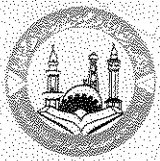

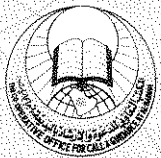

الديـــن الحـــق

تاليف

فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر

ترجمهُ للبنغالية

أ. ص. م طريق الإسلام

سنة الطبع ١٤١٩هـ

طبع على نفقة أحد المحسنين
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالبديعة والصناعية الجديدة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ص.ب: ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٩ - البديعة: تلفون ٤٣٣٠٨٨٨ (أربعة خطوط)
الصناعية: تلفون ٤٣٠٣٥٧٢ - فاكس ٤٣٠١١٧٢ المملكة العربية السعودية

সত্য দ্বীন

মূল আরবীঃ

আব্দুর রাহমান বিন হাম্মাদ আলে উমর

ভাষান্তরেঃ

আ,হু,ম,তরীকুল ইসলাম

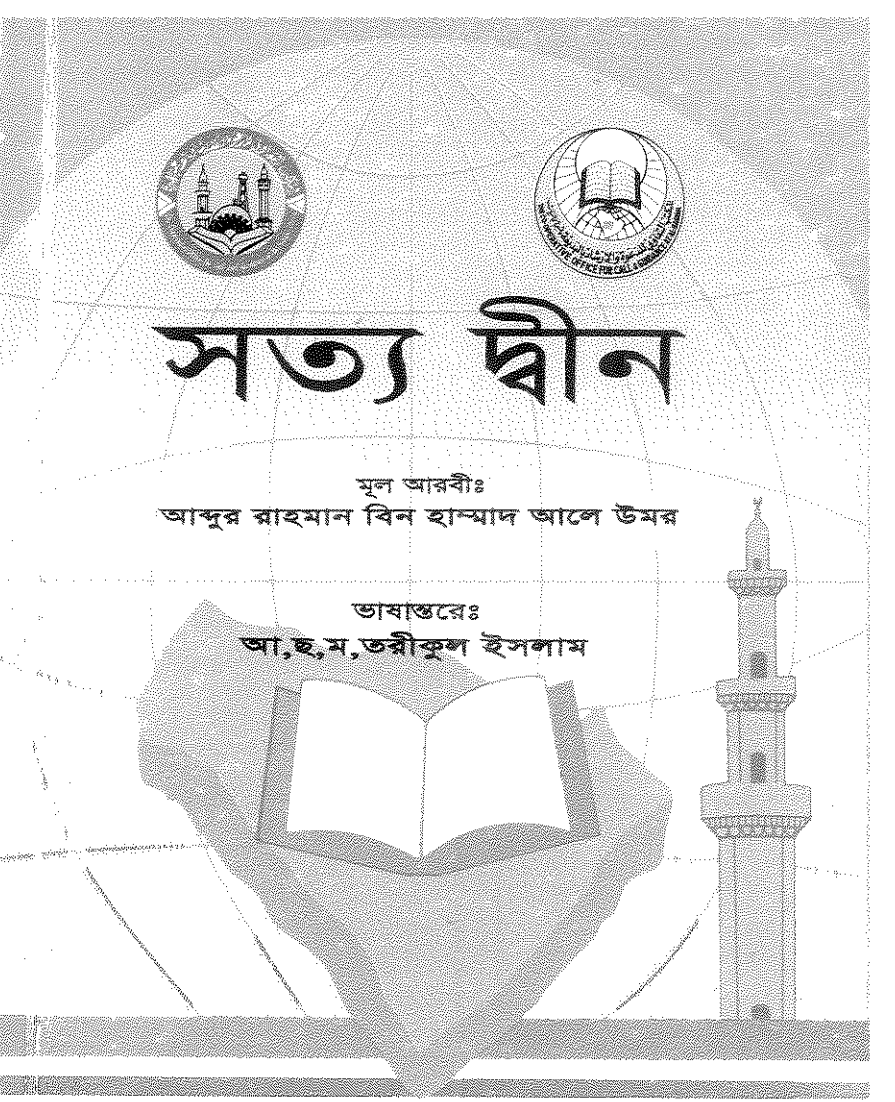

The Cooperative Offices for Call & Guidance at Al-Badiah & Industrial Area
Under the Supervision of the Ministry of Islamic Affairs Endowment Guidance & Propagation
P.O. Box: 24932 Riyadh 11456 - K.S.A. (Al-Badiah) Tel.: 4330888 (Four Lines)
(Industrial Area) Tel.: 4303572 - Fax: 4301122

Addresses of the Cooperative Offices for Call & Guidance

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS,
ENDOWMENT, GUIDANCE
& PROPAGATION
(Foreign Communities Section)
TEL. 01/4010904 RIYADH 11131

THE CO-OPERATIVE OFFICES FOR
CALL & GUIDANCE
AT AL-BADIAH & NEW INDUSTRIAL AREA
TEL. 01/4330888-4303572 FAX 4301122
P.O. BOX 24932 RIYADH 11456

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & GUIDANCE AT AL-BAT'HA
TEL. 01/4030142-4031587 FAX 4059387
P.O. BOX 20824 RIYADH 11465

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & GUIDANCE
AT UMM-ALHAMMAM
TEL. 01/4826466 FAX 4827489
P.O. BOX 31021 RIYADH 11497

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & GUIDANCE AT SULTANAH
TEL. 01/4240077 FAX 4251005
P.O. BOX 92675 RIYADH 11663

PROPAGATION & GUIDANCE CENTER
AT AL-DERAIAH
TEL. 01/4860606 FAX 4860284
P.O. BOX 70032 RIYADH 11567

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & GUIDANCE AT AL-RAWDAH
TEL. 01/4918051 FAX 4970561
P.O. BOX 78299 RIYADH 11642

AL-KHARJ FOREIGN COMMUNITIES
SECTION
TEL. 01/5481311 FAX 5440662
P.O. BOX 9 AL-KHARJ 11942

DAMMAM FOREIGN COMMUNITIES
SECTION
TEL. 03/8272772-8263535 FAX 8274700
DAMMAM 31131

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & GUIDANCE AT AL-AHSA
TEL. 03/5866672 FAX 5874664
P.O. BOX 2022 AL-AHSA 31982

PROPAGATION & GUIDANCE
CENTER AT AL-ZULFY
TEL. 06/4225657 FAX 4224234
P.O. BOX 182 AL-ZULFY 11932

FORIEGNERS & GUIDANCE CENTER
AT BURAYDAH
TEL 06/3248980 FAX 3245414 - P.O. BOX 142

FORIEGNERS & GUIDANCE CENTER
AT HAIL
TEL. 06/5334748 FAX 5432211 - P.O.BOX 2843

FORIEGNERS &GUIDANCE OFFICE
AT UNAIZAH
TEL 06/3644506 - P.O. BOX 808

PROPAGATION & GUIDANCE
CENTER AT ABHA & KHAMIS MUSHAIT
TEL/FAX 07/2240038 - P.O. BOX: ABHA

FORIEGNERS GUIDANCE CENTER
AT TAIF
TEL 02/7360822 - P.O. BOX 4155

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & FORIENNERS GUIDANCE
AT MAKKAH ALMUKARAMAH
TEL/FAX. 02/5360594 P.O. BOX: 3774

FORIEGNERS GUIDANCE CENTER
AT AL-HAMRA Dest. (JEDDAH)
TEL/FAX: 02/6656994
P.O. BOX 11203 JEDDAH 21453

THE CO-OPERATIVE OFFICE FOR
CALL & FOREIGNERS GUIDANCE
AT MUSHRIFAH Dest. (JEDDAH)
TEL. 02/6731754-6730431 FAX 6731147
P.O. BOX 15798 JEDDAH 21454

PROPAGATION & GUIDANCE CENTER
AT TABUK
TEL. 04/4211315 FAX 4211170 - P.O.BOX 2267

FORIEGNERS GUIDANCE CENTER
AT AL-MADINA AL-NABAWIAH
TEL: 04/8461393 - P.O. BOX: 10239

FORIEGNERS GUIDANCE CENTER
AT ARAR
TEL 04/6610513 - P.O.BOX 875

সত্য দ্বীন

মূল আরবীঃ
আব্দুর রাহমান বিন হাম্মাদ আলে উমর

ভাষান্তরেঃ
আ,ছ,ম,তরীকুল ইসলাম

সম্পাদনায়ঃ
শায়খ মিজানুররাহমান আবুলহুসাইন
(ফেণী)

The Cooperative Office For Call & Guidance at Al-Badiah - Communities Section
UndertheSupervisionoftheMinistryofIslamicAffairsEndowmentGuidance&Propagation
P.O. Box 24932 Riyadh 11456 - Tel. 4330888/4330470 - Fax. 4301122 - Saudi Arabia

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمر، عبدالرحمن بن حماد

الدين الحق / ترجمة طريق الإسلام. - الرياض.

١٦٤ ص ؛ ١٢X١٧ سم

ردمك: ١-٢٧-٧٩٩-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الإسلام ٢- الشريعة الإسلامية

أ- طريق الإسلام (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢١٠ ١٧/٠١٤٩

رقم الإيداع: ١٧/٠١٤٩

ردمك: ١-٢٧-٧٩٩-٩٩٦٠

নির্ভেজাল অকীদা-বিশ্বাস, সঠিক ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও নির্ভুল মৌলিক মাছয়ালা-মাছায়েল সম্বলিত এই দুর্লভ পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অনুদিত হল। শিরক ও বিদয়াতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বিভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ এ ভাষাভাষী আশা করি এথেকে সঠিক জ্ঞানের আলো লাভ করে ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অনুবাদে অজান্তে যা কিছু ভুল হয়েছে তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

অ,হ,ম,তরীকুল ইসলাম
তথ্য মন্ত্রণালয়, রিয়াদ
১৪১৫হিঃ / ১৯৯৪ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

মহান স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান - ৪

আল্লাহ কর্তৃক মানব সন্তান, জ্বিন
জাতিও অন্যান্যদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য- ১৫

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব,
কাজের প্রতিদান এবং বেহেশত ও
দোজখ সম্পর্কে- ১৭

মানুষের কৃতকর্ম ও কথাবার্তায় সংযম
প্রসংগে- ২৩

সাক্ষ্যদান- ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল (সঃ) সম্পর্ক জ্ঞান
আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ
(সঃ)এর প্রতি ঈমান আনার আহবান- ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

সত্য দ্বীন (ইসলাম) সম্পর্কে জ্ঞান- ৩৭

ইসলামের সংজ্ঞা- ৩৮

ইসলামের স্তম্ভসমূহ (আরকান)- ৪৩

মুক্তি প্রাপ্ত দল- ৫৬

নির্দেশ প্রদান ও শরীয়ত প্রণয়নের
অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত- ৫৯

'নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম) আল্লাহর
রাসূল.এই সাক্ষ্যদানের অর্থ- ৬২
আহ্বান- ৬৪
ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ- নামাজ- ৬৫
নামাজের হুকুম আহকাম- ৬৬
নামাজের পদ্ধতি- ৭১
যাকাত- ৭৭
রোযা- ৮০
হজ্জ- ৮৩
হজ্জ এবং ওমরায় করণীয় বিষয়াদি- ৮৭
ইহরামের জন্য করণীয়- ৮৮
বিশ্বাস (ঈমান)- ৯৭
ইসলামের জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ- ১০২
চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামের পদ্ধতি- ১০৫
পঞ্চম অধ্যায়
কতিপয় ভ্রান্তির উন্মোচন- ১৪৬
ইসলামের উৎসসমূহ- ১৫০
ইসলামী মাযহাব সমূহ- ১৫২
ইসলাম বহির্ভূত দলসমূহ- ১৫৪
মুক্তির দিকে আহ্বান- ১৬০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলবর্গের প্রতি দরুদ ও সালাম। অতঃপর নর হোক অথবা নারী হোক, প্রত্যেক জ্ঞানীর জন্যে মুক্তির এই আহ্বানকে উপস্থাপন করছি। আল্লাহর কাছে আশা করছি যে, পথভ্রষ্টরা এথেকে কল্যাণ লাভ করবে। আমি ও যারা এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন সকলের জন্যে উত্তম সওয়াবের আশা করছি। অতঃপর আমি বলছি এবং আল্লাহই সাহায্যকারী।

হে জ্ঞানবান, আপনার যে রব আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে জানা ব্যতীত ইহকাল ও পরকালে কোন মুক্তি ও মঙ্গল নেই। তাঁর উপরে ঈমান আনা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা আপনার রব কর্তৃক আপনার কাছে ও সকল মানুষের কাছে প্রেরিত নবীকে জানা, তাঁর উপরে ঈমান আনা এবং তাকে অনুসরণ করা, আপনার যে দ্বীন গ্রহণ করতে আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন সে সত্য দ্বীনকে জানা এর প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত আপনার কোন মুক্তি ও কল্যাণ নেই।

প্রথম অধ্যায়

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ [১] সম্পর্কে জ্ঞান

হে জ্ঞানবান, জেনে রাখুন, নিশ্চয় যিনি আপনাকে নাস্তি (অস্তিত্বহীনতা) থেকে তৈরী করেছেন সেই আল্লাহ্ই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলার [২] প্রতি ঈমান গ্রহণকারী জ্ঞানীরা তাঁকে চোখে না দেখলেও সে সমস্ত নিদর্শনাবলী তিনি যে বিদ্যমান, তিনি যে স্রষ্টা, তিনি যে সকল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী এর নিশ্চিত প্রমাণ পেশ করে তার মাধ্যমে তারা তাঁকে জেনেছেন। এ সকল প্রমাণাদি হচ্ছেঃ-

১ - জগত, মানুষ ও জীবন। এগুলো সবই নশ্বর। যার প্রথম ও শেষ রয়েছে। যা অন্যের মুখাপেক্ষী। নশ্বর ও অন্যের মুখাপেক্ষী সবই সৃষ্ট আর, প্রত্যেক সৃষ্টের জন্যই স্রষ্টা অত্যাবশ্যক, এই মহান স্রষ্টাই হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে

১- (আল্লাহ্) সমগ্র জগত, মানুষ ও সবকিছুর ইলাহ্ এর নাম। এটি হচ্ছে তাঁর সত্ত্বার নাম। পবিত্র সত্ত্বাকে তিনি এই নামে নামকরণ করেছেন। (الإله الحق) সত্যিকারের ইলাহ্।

২-(تعالى) সম্মানসূচক ও আল্লাহ্র গুণগান সম্বলিত শব্দ যা তাঁর সর্বোচ্চতা ও পবিত্রতাকে নির্দেশ করে سبحانه (অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র)

বলেছেন। তিনি স্রষ্টা, তিনি সমস্ত বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরে অবতীর্ণ কিতাব সমূহে এটি আলোচিত হয়েছে এবং আল্লাহর রাসুলগণ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাক্যকে মানুষের কাছে পৌছিয়েছেন। তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানি- য়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন- إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ
ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ
أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে উর্ধ্বাবস্থান নিলেন। তিনি রাত্র দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন যা দ্রুতগতিতে এর পিছে অনুসরণ করে। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি তাঁর নির্দেশ পালনে নিয়োজিত। অবশ্যই সৃষ্টি ও নির্দেশের অধিকার তাঁরই। সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহই অতীব বরকতময়।" (আল-আরাফঃ ৪৫)

আয়াতটির সারমর্ম হচ্ছেঃ- আল্লাহ সমগ্র মানবজাতীকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তিনিই তাদের প্রতিপালক যিনি সমগ্র আসমান জমিন ছয়

দিনে সৃষ্টি করেছেন।[১] এটিও জানাচ্ছেন যে, তিনি আরশে উর্ধ্বাবস্থান নিয়েছেন।[২] আরশ হচ্ছে আসমান

১- ক্রমানুসারে আল্লাহর ইচ্ছাকৃত এই সৃষ্টি তার হিকমতেরই অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় তিনি চোখের পলকের চেয়েও কম সময়ে সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। কেননা তিনিই তো বলেছেন- যখন তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, বলেন "হয়ে যাও হয়ে যায়।"

২- আরবদের ভাষা তথা কুরআনের ভাষায় استوى على شيئ
استوى الله على عرشه এর অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর উপরে অবস্থান নেওয়া সর্বোচ্চ হওয়া
এর অর্থ, তিনি আরশের উপরে এমনি সর্বোচ্চ অবস্থান নিয়েছেন যা তার সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার জন্য মানানসই। তবে কোন অবস্থায়, কি রূপে তা কেউ জানে না। এর অর্থ সাম্রাজ্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার করা নয়, যেমন পথভ্রষ্টকারীরা ধারণা করে থাকে, যারা আল্লাহ যে সমস্ত গুণে নিজেকে ও তার রাসূলগণ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহকে গুণান্বিত করেছেন, সে সমস্ত গুণাবলীর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তারা এটা এই ভেবে করে যে, যদি ঐ সমস্ত গুণে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হয় তাহলে কোন সৃষ্টির সমতুল্য বলে তিনি গণ্য হবেন। বস্তুত এটি ভিত্তিহীন মতবাদ। কেননা সৃষ্টতুল্য অর্থ হচ্ছে এই বলা যে, তাঁর এই গুণাবলী সৃষ্টের এই গুণাবলীর সমতুল্য তাঁর এই গুণাবলী তাদের এই গুণের মত। কিন্তু কাল্পনিক তুলনা, উপমা, কেমনত্ব দ্বারা আমরা তার বিশেষণকে বুঝতে অক্ষম। এসব কিছুকে গ্রহণ করে তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য যে কোন গুণে তাকে গুণান্বিত করাই হচ্ছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণের পদ্ধতি। এটাকেই আমাদের সালফে ছালেহীনরা অনুসরন করেছেন। এটাই সত্য যেটাকে মুমীনদের আকড়ে ধরা ওয়াজিব, যদিও অনেকেই এটাকে পরিত্যাগ করেছে।

সমূহের উপরে, যা সৃষ্টের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রশস্ত। আল্লাহ এর উপরে থেকে সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এগুলোর কোন বিষয় তার অগোচরে থাকেনা। তিনি এটিও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি রাতকে সৃষ্টি করেছেন যা দিনকে অন্ধকার দিয়ে ঢেকে ফেলে এবং দ্রুতগতিতে তা দিনকে অনুসরণ করে। তিনি সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্ররাজী সবকিছুকে বিন্যাস করে সৃষ্টি করেছেন। তারই নির্দেশে তারা তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। তিনি আরও বলেছেন- সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দেয়ার অধিকার একক তার জন্যই সংরক্ষিত। তিনি সদা-সর্বদা অনেক কল্যাণ দান করে থাকেন, তিনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক যিনি তাদেরকে নাস্তি থেকে তৈরী করেছেন। তাদেরকে নিয়ামত দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত্র, দিন, সূর্য ও চন্দ্র অন্যতম। সূর্যকে তোমরা সেজদা করনা এবং চন্দ্রকেও না। ঐ আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলোকে তৈরী করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করতে চাও"। (হামীম সিজদাঃ ৩৭)

আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, রাত্র-দিন, সূর্য-চন্দ্র তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম। সাথে সাথে সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদাও

করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা এ দুটিও অন্যান্য জিনিসের মত সৃষ্টের অন্তর্ভুক্ত, আর সৃষ্টকে ইবাদত করা একেবারেই অবৈধ। আর এই সিজদাও ইবাদতের অংশ বিশেষ এবং অন্যান্য আয়াতের মত এখানেও তিনি একক আল্লাহকে সিজদার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা তিনি স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

২- আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদেরকে যে অকাট্য প্রমাণ সমূহের পথ নির্দেশনা দিচ্ছে তন্মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের সৃষ্টি অন্যতম। এ দুইয়ের বিদ্যমানতা আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৩- ভাষা ও রং-এর পার্থক্য। কখনও দুইজন একই কণ্ঠের ও একই রং-এর পাওয়া যায়না বরং এদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

৪- ভাগ্যের পার্থক্য- একই সময় অনেকেই জ্ঞানী চিন্তাশীল বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও ধন মর্যাদা ও সুন্দরী স্ত্রী লাভ করতে আগ্রহী, কেউ ধনী কেউ দরিদ্র কেউ শাসক কেউ শাসিত হয়েই থাকতে হয়। কেননা, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত সে অন্যকিছু অর্জন করবেনা। এর মধ্যে আল্লাহ চান এমন ধরনের গুঢ় রহস্য নিহীত রয়েছে সেটি হচ্ছে- মানুষদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান এবং সকলের প্রয়োজন পুরণ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য একের দ্বারা অপরের খেদমত করাতে চান। এ

পৃথিবীতে আল্লাহ যার ভাগ্য ভাল নির্ধারণ করেন নি তার জন্য বেহেশতে অতি উত্তম নিয়ামত সংরক্ষণ করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। যদি সে আল্লাহর উপর ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে থাকে। এর পরেও আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রদের মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে এমন বৈশিষ্ট দান করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা অনেক ধনীজন পায়নি। এটি আল্লাহর হিকমত ও ন্যায় বিচারের নিদর্শন।

৫- নিদ্রা ও সত্য স্বপ্ন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অদৃশ্য বিষয়ে সুসংবাদ দান বা ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। "وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"

৬ - রূহ ঃ যার বাস্তবতা সম্পর্কে একক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

৭- মানুষ এবং তার শরীরের ইন্দ্রিয় শিরা উপশিরাও মস্তিষ্কের সরঞ্জাম ও পরিপাকের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি।

৮- আল্লাহ মৃত পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন রং-এর বিভিন্ন প্রয়োজনের বিভিন্ন তৃণ ও বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের অসংখ্য প্রমাণাদির মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রমাণ। যে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এবং যে সম্পর্কে এইমর্মে বিবৃতি দিয়েছেন যে, এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব ও তিনি যে স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টের নিয়ন্ত্রণকারী তার উজ্জল প্রমাণ।

৯- যে প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাহচ্ছে সে তার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। যে এটাকে অস্বীকার করে, সে তার আত্মাকে ভ্রান্তি ও হতাশায় নিক্ষেপ করে। উদাহরণ স্বরূপ কম্যুনিষ্টের কথা উল্লেখ করা যায়। সে[১] এ জীবনে ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে বাস করে এবং যিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে তাকে তৈরী করলেন ও নিয়ামতের দ্বারা বড় করলেন তাকে মিথ্যা বলার কারণে মৃত্যুর পরে তার গন্তব্যস্থান হবে জাহান্নাম। আল্লাহর গুণের ভিতরে এটিও যে, তিনি প্রথম যার কোন শুরু নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। মৃত্যুবরণ করবেন না এবং কখনও শেষ হবেন না। তিনি ধর্মী নিজেই প্রতিষ্ঠিত অন্যের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"অসীম দাতা ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। তুমি বল, তিনিই আল্লাহ অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো জন্ম দেননি, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং কেউ তাঁর সমতুল্য ও নেই" (সূরা ইখলাস)

১- যদি সে তওবা করে ফিরে আসে। তাঁর উপর, তাঁর রাসুল ও তার দ্বীনের উপর ঈমান আনার মত ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাহলে আল্লাহও তাওবাকারীদের দিকে ফিরে আসেন।

আয়াতের মর্মার্থঃ- যখন কাফেররা শেষ নবীর কাছে আল্লাহর গুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করল তখন আল্লাহ এই সূরা অবতীর্ণ করেন এবং রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের উদ্দেশ্যে এই বলার নির্দেশ
দিলেন যে, আল্লাহ এক এবং তার কোন অংশীদার নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও নিয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র বিশ্বজগত, মানুষ জাতি ও সব কিছুর উপরে তাঁরই একক কর্তৃত্ব রয়েছে। সকল প্রয়োজন মিটানোর জন্য মানুষদের শুধুমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া ওয়াজিব। তিনি জন্ম দেন নাই, জন্মও নেন নাই। তাঁর কোন পুত্র বা কন্যা, পিতা অথবা মাতা হতেই পারেনা। বরং তাঁর ক্ষেত্রে এগুলো যে হতেই পারেনা, অন্য সূরাগুলোতেও তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা, পর্যায়ক্রমে আসাও জন্মলাভ সৃষ্টের গুণ বিশেষ। এরদ্বারা তিনি খৃষ্টানদের কথা- 'ঈসা আল্লাহর পুত্র' ও ইয়াহুদীদের কথা 'উযায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং অন্যান্যদের কথা 'ফিরিশতারা আল্লাহর কন্যা' কে রহিত করেছেন। তাদের তিরস্কার করেছেন এবং তাদের কথা বাতিল ঘোষণা করেছেন, এবং একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নিজ কুদরতে আল্‌মাসীহ ঈসা (আঃ) কে পিতা ছাড়াই মাতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, যেমন মানব পিতা আদম (আঃ) কে মাটি হতে ও মানব মাতা হাওয়া (আঃ) কে আদমের পাঁজর হতে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর আদম (আঃ) হাওয়া (আঃ) কে তার পার্শ্বে দেখলেন। এরপর আদম সন্তানদেরকে নর

নারীর বীর্য হতে তৈরী করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন সব কিছুইকে অবিদ্যমানতা হতে এবং এরপর সকল সৃষ্টকে বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা। যখন তিনি এই নিয়ম পদ্ধতিকে যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করতে চান করেন। যেমন ঈসা (আঃ) কে পিতা ছাড়া মাতা হতে সৃষ্টি করেন। তাঁকে দোলনায় কথা বলানো, মুছা (আঃ) এর লাঠিকে ধাবমান সাপ বানানো ও তদ্বারা সমুদ্রের উপরে আঘাত করে তন্মধ্যে তিনি ও তাঁর কওমের অতিক্রমযোগ্য রাস্তা বানানো, সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চন্দ্র দ্বিখন্ডীত করা, গাছ অতিক্রমের সময় গাছে তাঁকে সালাম প্রদান জানান। প্রাণীর পক্ষথেকে তার বিশ্বস্থতার এমন সাক্ষ্য প্রদান যা মানুষেরা শুনেছে। তাঁর কথা ছিল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। ঠিক তেমনিভাবে তাঁকে মস্‌জিদে হারাম হতে মস্‌জিদে আক্‌সা পর্যন্ত বোরাকে করে রাত্র ভ্রমণ করানো হয়। এবং সেখান হতে আস্‌মানে উঠানো হয়। তার সাথী ছিলেন জিব্রাঈল (আঃ)। যখন আস্‌মানের উপরে..... নিকটে পৌছিলেন আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বললেন। তাঁর উপর নামায ফরজ করার পর তিনি মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এবং আসমানের প্রত্যেক অধিবাসীগণ তাঁকে দেখেছেন। এটা ছিল এক রাত্রিতে সূর্য উঠার পূর্বে। রাত্র ভ্রমণ ও

মিরাজের ঘটনা কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

আল্লাহর অন্যান্য গুণের মধ্যে শ্রবণ, দেখা, জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তিও রয়েছে। সবকিছু শোনেন ও দেখেন। কোন পর্দা তাঁর শোনা ও দেখার প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। মাতৃগর্ভে কি রয়েছে এবং মানুষের অন্তরে কি লুকায়িত, যা হয়েছে ও যা হবে, সব কিছুই তিনি জানেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা পোষণকারী। যখন যা ইচ্ছা করেন বলেন "হয়ে যাও" অতঃপর তা হয়ে যায়। তাঁর পবিত্র সত্ত্বা নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যখন চান, যার সাথে চান, তার সাথে কথাবার্তা বলেন। তিনি মূছা (আঃ) ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলেছেন। পবিত্র কুরআনের অক্ষর সমূহ ও অর্থসমূহ আল্লাহর ই বাণী। তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর তিনি এটি অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর বাণী ও গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ; এটি সৃষ্ট কিছু নহে যেমন পথভ্রষ্ট মুতাযিলারা বলে থাকে। তিনি নিজকে নিজে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন তন্মধ্যে চেহারা, হাত, ঊর্ধ্বাবস্থান, অবতীর্ণ হওয়া, [১] খুশী হওয়া, রাগ করাও রয়েছে।

(১) ঐ হাদীসের আলোকে যেখানে বলা হয়েছে,"আমাদের প্রতিপালক শেষ রাতের একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন"।

তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি খুশী হন ও কাফির ও তার অপছন্দ কার্যাদিতে নিমজ্জিতদের প্রতি রাগান্বিত হন। তাঁর খুশী হওয়া রাগ করা, চেহারাও হাত থাকা উর্ধ্ববিস্থান নেয়া অবতীর্ণ হওয়া তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর মত তার শ্রেষ্টত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল গুণাবলী যা কোন সৃষ্টের গুণের সাথে তুলনা হয়না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীছে এটি প্রমাণিত যে, মুমিন বান্দাগণ কেয়ামতের দিনে ও জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে দেখবেন। আল্লাহর গুণাবলী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূলে করীম (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সমূহে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। আপনি সেগুলো বিস্তারিত ভাবে দেখে নিন।

আল্লাহ কর্তৃক মানব সন্তান, জিন্ন জাতি ও অন্যান্যদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জানলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনার প্রতিপালক, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে নিশ্চয় তিনি আপনাকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। বরং তার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর উক্তিই এর প্রমাণঃ وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

"এবং আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। তাদের থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য চাইনা। এবং আমাকে তারা খাওয়াক এটাও চাইনা। নিশ্চয় তিনিই আল্লাহ যিনি খাদ্যদাতা, শক্তির অধিকারী সুদৃঢ়"। (আয যারিয়াত-৫৬-৫৮)

আয়াত গুলোর সারার্থ হচ্ছে- প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন- তিনি জিন্ন জাতি ও আদম সন্তানদেরকে শুধুমাত্র একক তাকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অমুখাপেক্ষী অতঃপর তিনি তাদের থেকে রিযকও চাননা, খানাও চাননা; কেননা তিনিই রিযকদাতা, শক্তিশালী। মানুষ বা অন্য সব কিছুকে একমাত্র তার পক্ষ থেকেই রিযক দেয়া হয়। তিনি ঐ সত্তা যিনি বৃষ্টি দান করেন এবং মাটির মধ্যে হতে রিযক বাহির করেন।

অপরদিকে পৃথিবীর জ্ঞানহীন অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কে বলা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এগুলোকে মানুষের জন্য তৈরী করেছেন যাতে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষরা এদের সহযোগীতা নিতে পারে এবং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্ট ও প্রতিটি নড়াচড়া ও নিস্তব্ধতাকে আল্লাহ এক গুঢ় রহস্যময় করে তৈরী করেছেন যা তিনি কুরআনে বর্ণনা করেছেন ও জ্ঞানের মান অনুযায়ী আল্লাহর শরীয়তের আলিমগণ এটা উপলব্ধি ও করেন।

এমনকি বয়সের ভিন্নতা, রিযক, বিপদ আপদের পার্থক্য তাও আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। যাতে জ্ঞানী বান্দাদের পরীক্ষা করা যায়। অতঃপর আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপরে যিনি খুশী থাকেন ও তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন সে কাজ করার জন্য কষ্ট করেন তার উপরে আল্লাহও খুশী হন এবং তিনি দুনিয়াতে ও মৃত্যুর পরে আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অতঃপর যে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপরে খুশী থাকেনা, তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনা তার আনুগত্য দেখায়না আল্লাহর তার উপর রাগান্বিত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে ভাগ্যাহত, সে হতভাগ্য বিড়ম্বনায় পতিত দুর্ভাগা। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাচ্ছি। ও তার কাছে তার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব কিতাব, কাজের প্রতিদান এবং বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে ঃ

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জানলেন যে নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে তার ইবাদাত করার জন্য তৈরী করেছেন অতঃপর জানুন যে, তিনি তার রাসুলদের উপরে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থে, তিনি যে মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থান করবেন ও প্রতিফলের নিবাসস্থলে আপনার কর্মের প্রতিফল দিবেন তা বলে দিয়েছেন। কেননা মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে এই কর্মময় নশ্বর জগতের জীবন হতে মৃত্যুর পরে ফলাফলের ও চিরস্থায়ী জগতে প্রস্থান করে। অতএব যখন আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে যায়, আল্লাহ মৃত্যুর ফিরিশতাকে তার শরীর হতে রূহকে কবজ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে শরীর হতে রূহ বাহির হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করার পরে মৃত্যু বরণ করে। এ প্রেক্ষাপটে রূহ যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তাঁর আনুগত্য দেখায়ে থাকে তাকে আল্লাহর নিয়ামতের গৃহ (জান্নাত) এ রেখে দেবেন। তার রূহ যদি আল্লাহকে অস্বীকার কারী হয়, মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও প্রতিফল লাভকে মিথ্যা বলে থাকে, তাকে আল্লাহ শাস্তি গৃহে (আগুন) ঐ সময় পর্যন্ত রেখে দিবেন

যতক্ষণ না দুনিয়ার নির্ধারিত দিন সমাপ্ত হয়ে কিয়ামত অনুষ্ঠিত না হয় ও একক আল্লাহ ছাড়া সকল অবশিষ্ট সৃষ্ট মৃত্যুবরণ না করে। অতঃপর আল্লাহ সকল সৃষ্টকে এমনকি পশুকেও পুনরুত্থান করবেন এবং প্রথমে যেমনভাবে তাঁর সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি শরীরিক পূর্ণতা দান করে তাদের শরীরে তাদের রূহ ফিরিয়ে দিবেন। এজন্য যে, পুরুষ মহিলা, শাসক, শাসিত ধনী দরিদ্র সকলেই কৃত কর্মের ফলাফল দান ও হিসাব কিতাব করা যায়। কারো প্রতি যুলম করবেন না। অত্যাচারিত অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ নিবে। এমনকি প্রাণীরাও যারা তার উপরে অত্যাচার করে পরস্পরে প্রতিশোধ নিবে। অতঃপর তিনি এদরকে নির্দেশ দিবেন "মাটি হয়ে যাও" কেননা এরা বেহেশত বা দোযখ কোথাও প্রবেশ করবেনা। মানব সন্তান ও জিন্ন প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী পুরস্কার দেয়া হবে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাঁর আনুগত্য করেছিলেন, তাঁর রাসূলদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরন করেছিলেন তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যদিও তিনি সব চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি হয়ে থাকেন। এবং কাফির মিথ্যাবাদীদেরকে দোযখে প্রবেশ করাবেন যদিও তারা পৃথিবীতে সর্বাধিক ধনী ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"

"নিশ্চয় যে সবচেয়ে তাকওয়া সম্পন্ন সেই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদাবান" (হুজরাত-১৩)

বেহেশতঃ-

বেহেশত নিয়ামতের স্থান। এখানে বিভিন্ন প্রকারের এমন নিয়ামত বিদ্যমান যা কারো পক্ষে অনুমান সম্ভব নহে। এখানে একশত স্তর রয়েছে। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও তাদের আনুগত্যের মান অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের অধিকারী সেখানে অবস্থান করবেন। বেহেশতের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসীকে ঐ নিয়ামত দেয়া হবেই যা দুনিয়ার সবচেয়ে নিয়ামত উপভোগ কারী বাদশাহর নিয়ামতের চেয়ে সাতশত গুণ বেশী।

দোযখঃ

আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এটি মৃত্যুর পরে আখেরাতে শাস্তির স্থল। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে; যার স্মরণ অন্তরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে, চক্ষুকে কাঁদায়। যদি আখিরাতে মৃত্যুবরণের সুযোগ থাকত তাহলে শুধু এর অবস্থা দেখেই দোযখবাসীরা মৃত্যুবরণ করত। পক্ষান্তরে মৃত্যু মাত্র একবারই হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষগণ ইহলৌকিক জীবন থেকে পরলৌকিক জীবনে প্রস্থান করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পূর্ণাঙ্গ

আকারে মৃত্যু, পুনরুত্থান, হিসাব, পুরস্কার, বেহেশত ও দোযখের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে যা যা এখানে আমরা উল্লেখ করলাম তা ঐগুলোর ইংগীত মাত্র।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাবকাল, প্রতিফল লাভ সম্পর্কে অসংখ্য দলীল রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

"এ (মাঠি) থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এ থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বাহির করব। (ত্বাহা ঃ ৫৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

"সে আমার সম্পর্কে মিছাল (উপমা) বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম বৃত্তান্ত ভুলে গেছে। সে বলে- পচা গলা হাড়কে কে জীবিত করবে? বলে দাও এ গুলোকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি সেগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্ট সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী" (ইয়াসীন-৭৮,৭৯)

আল্লাহ বলেনঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ
بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ تغابن

"কাফিররা ধারণা করেছে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবেনা। তুমি বল, অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হবে অতঃপর নিশ্চয় তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং এটি আল্লাহর পক্ষে একবারেই সহজ" (আত- তাগাবুনঃ৭)

আয়াত সমূহের সারমর্ম হচ্ছেঃ- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রথম আয়াতটিতে বলেছেন, নিশ্চয় তিনি মানব সন্তানদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এটা ঐ সময়ের কথা যখন তিনি তাদের পিতা আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন। আরও বলেনঃ তিনি অবশ্যই তাদেরকে মৃত্যুর পরে তাদের মর্যাদার কারণে কবরের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। এবং দ্বিতীয়- বার এ থেকে তাদেরকে বাহির করবেন। এরপর প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই আল্লাহ তাদের হিসাব কিতাব করবেন অতঃপর তাদের পুরস্কার দিবেন।

দ্বিতীয় আয়াতটিতে পুনরুত্থানকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফির যে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া হাড় জীবিত করাকে আশ্চর্য মনে করে আল্লাহ তার

প্রতিউত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, তিনি এ হাড়কে জীবিত করতে সক্ষম। কেননা তিনি একে নাস্তি হতে অস্তিত্বে প্রথমবার নিয়ে এসেছিলেন। এবং তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফিরদের ধারণাকে বাতিল প্রতিপন্ন করেছেন ও তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহর শপথ করে জোরালো ভাষায় বলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "নিশ্চয় অতি নিকট সময়ে আল্লাহ তাদেরকে উত্থান করবেন এবং তাদের সকল কৃতকর্ম যা তারা করেছে জানিয়ে দিবেন এর উপরে প্রতিফল দান করবেন এবং একাজ আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয় তিনি পুনরুত্থান ও দোযখের আযাবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীকে পুনরুত্থান করবেন ও দোযখের আগুনে সাজা দিবেন। তাদেরকে বলা হবেঃ

ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

"ঐ দোযখের শাস্তি উপভোগ কর যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেত" (সিজদাহ-২০)

মানুষের কৃতকর্ম ও কথাবার্তায় সংযম প্রসংগে

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানাচ্ছেন। নিশ্চয় মানুষগণ যা করে ও করবে ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য হোক; সব কিছুই আল্লাহ জানেন। এ গুলো তিনি তার নিকট লাউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। এরপর তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য একজন ডানে ভাল কৃতকর্ম লেখার জন্য ও বামে অপরজন খারাপ কৃতকর্ম লেখার জন্য দুইজন ফিরিশতাকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাদের থেকে কোন কিছু বাদ পড়েনা। আল্লাহ আরও বলেছেন, নিশ্চয় হিসাবের দিনে প্রত্যেককে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, যাতে তারা যা বলেছে ও করেছে লেখা হয়েছে। অতঃপর তারা তা পড়বে এবং এ থেকে কোন কিছুকে অস্বীকার করবে না। যদি কেউ কিছু অস্বীকার করে তাহলে তার কান, চক্ষু, হাতদ্বয় ও চামড়া যা যা করেছে, আল্লাহ সে সম্পর্কে কথা বলাবেন। বিস্তারিত ভাবে মহাগ্রন্থ কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

"কোন শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয়না যা সংরক্ষনের জন্য চির উপস্থিত পর্যবেক্ষক (ফিরিশতা) তার কাছে বিদ্যমান না থাকে"। (ক্বাফ-১৮)

আল্লাহ বলেন-

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

"এবং নিশ্চয় তোমাদের উপরে তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মানিত আমল লিখকবৃন্দ নিযুক্ত রয়েছেন। তোমরা যা কর তা তারা জানেন"। (ইনফিতার-১০-১২)

আয়াত সমুহের ব্যাখ্যাঃ-

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দুইজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তার ডান পার্শ্বে থাকেন 'রকীব' যিনি তার সমগ্র পূণ্যের কাজ লিপিবদ্ধ করেন। বাম পার্শ্বে থাকেন 'আতীদ' যিনি তার পাপের কাজ সমূহকে লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে শেষ দুটি আয়াতে তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি প্রত্যেকের জন্য সম্মানিত ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, তাদের সকল কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য। এবং আরো জানায়েছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত ফিরিশতাদেরকে মানুষের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে জানা ও লেখার শক্তি দিয়েছেন যেমন তিনি ও এগুলোকে জেনেছেন এবং নিজের নিকটে লাউহে মাহফুজে তাদের সৃষ্টির পূর্বেই লিখে রখেছেন।

সাক্ষ্যদান (শাহাদাত)

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-

"নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার রাসূল। প্রেরিত পুরুষ। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি বেহেশত সত্য। দোযখ সত্য। এবং কিয়ামত সমাগত, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ কবরে অবস্থিত সকলকে হিসাব দান ও পুরস্কার দেয়ার জন্য পুনরুত্থান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তার কিতাবে অথবা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারফত যা বলেছেন সবই সত্য। হে জ্ঞানবান, আমি আপনাকে ঐ সাক্ষ্যদানের প্রতি ঈমান আনা এর ঘোষণা দেয়া এবং দাবী অনুযায়ী আমল করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। এটিই পরিত্রাণের পথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জ্ঞান

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি জেনেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহই আপনার রব, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আপনার কর্মের উপরে আপনাকে পুরস্কার দেয়ার জন্য পুনরুত্থান করবেন। এখন জেনে নিন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনার ও সমস্ত মানুষের নিকট রাসূল হিসেবে মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে তাঁর আনুগত্য করতে ও অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটিও বলে দিয়েছেন যে, সঠিক ইবাদত সম্পর্কে জানতে হলে সেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম এর আনুগত্য ছাড়া এবং তাঁর কাছে প্রেরিত শরীয়ত ব্যতীত আল্লাহর ইবাদতের কোন রাস্তা নেই। এই সম্মানিত রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর অনুসরণ করা সমগ্র মানুষের উপর ওয়াজিব। যিনি সর্বশেষ রাসূল তিনি সমগ্র মানুষের রাসূল। তিনি ঐ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম); ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের দুই গ্রন্থ নিয়ে অবাঞ্ছিত খেলা ও পরিবর্তন- পরিবর্ধন শুরু করার পূর্বে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করত তার মধ্যে চল্লিশ জায়গায় হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) যার সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। [১]

তিনি ঐ সম্মানিত নবী যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের রিসালতের ধারার সমাপ্তি টেনেছেন। সকল মানুষের কাছে তাকে পাঠিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশেমী আল কুরাইশী। আল্লাহর নবী ইসমাঈল (আঃ) ও আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আঃ) থেকে প্রবাহিত বংশে পৃথিবীর সবচেয়ে বুনিয়াদী গোত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ট, সম্ভ্রান্ত ও সবচেয়ে সত্যবাদী। সর্বশেষ এই রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্ম লাভ করেন। যে রজনীতে তিনি জন্মলাভ করেন এবং যে সময় তিনি তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হন, তখন সুবৃহৎ আলোকরশ্মিতে জগত আলোকিত হয়েছিল। মানুষ থমকে গিয়েছিল। ইতিহাস গ্রন্থ আলোড়িত হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কাতে কাবার মধ্যে যে সমস্ত মুর্তিকে পূজা করত সেগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। পারস্য সম্রাট কিস্‌রার রাজ সিংহাসন কম্পিত হয়েছিল। দশোধিক আলিন্দ ভেঙ্গে পড়েছিল। পারস্যবাসীরা যে অগ্নিকে পূজা করত তা দীর্ঘ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত অনির্বাপিত ছিল এই অগ্নি নিভে গিয়েছিল। এ সমস্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীর

---

(১) শাইখুল ইসলাম আহমদ বিন তাইমীয়া প্রণীত আল-জওয়াবুস্ সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, এর প্রথম খন্ড ও আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইবনিল কাইয়িম প্রণীত হিদায়াতুল হায়ারী সীরাতে ইবনি হিশামে ইবনি কাছিরের ইতিহাস গ্রন্থের নবুওতের অলৌকিক ঘটনাবলী অংশে দ্রষ্টব্য।

জন্য শেষ রাসূলের জন্মের ঘোষণা। তিনি অতি নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে মূর্তিকে পূজা করত তা ভেঙ্গে ফেলবেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকবেন এবং তারা এই সত্য দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবেন। যদি তারা এই দ্বীন গ্রহণে অবাধ্য হয় তাদের বিরুদ্ধে তিনি ও তার অনুসারীরা জিহাদ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর এদেরকে সাহায্য করবেন। দুনিয়ার মধ্যে নূর স্বরূপ যে দ্বীন, তিনি তার প্রসার ঘটাবেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণের পরে বাস্তবে এটাই ঘটেছিল। আল্লাহ তার শেষ রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তারই পূর্ববর্তী রাসূল ভাইদের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট দান করেছেন। এমনকি তিনি সর্বশেষ রাসূল তাঁর পরে আর কোন রাসূল নেই। তাঁর রিসালাতকে সার্বজনীন করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সকল মানুষই মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত। যিনি তাঁর আনুগত্য দেখাবেন এবং তাঁকে অনুসরন করবেন,তিনি বেহেশতে প্রবেশ করবেন।আর যিনি তার অবাধ্য হবেন তিনি দোযখে প্রবেশ করবেন। এমনকি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণও তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য। যে তাঁর অনুসরন করবেনা তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা সে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদেরকে অস্বীকার করল। যারা হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরন করবেনা হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈস

(আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, আল্লাহ তাদেরকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া ও যখন আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করবেন তাদের উম্মতদের ও তাঁকে (মুহাম্মদ) অনুসরন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তিনি যে দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন এটি সেই দ্বীন যা দিয়ে আল্লাহ তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন। এবং এই সর্বশেষ সম্মানিত রাসূল এর যুগে সেটাকে পরিপূর্ণ ও সহজ করেছেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইসলাম সহ প্রেরনের পরে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনকে গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নহে। কেননা এটি পরিপূর্ণ দ্বীন, যা অন্যান্য দ্বীনকে রহিত করেছে, কেননা এটি সংরক্ষিত সত্য দ্বীন। সুতরাং ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন তেমনটি নেই। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী প্রত্যেক মুসলমান হযরত মূসা, হযরত ঈসা ওঅন্যান্য সকল নবী (আঃ) এর অনুসারী বলে গণ্য। আর ইসলামের বাহিরের সবাই হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য সকল নবীর অস্বীকারকারী। তাই এরা যতই মূসা ও ঈসা (আঃ) এর অনুসারী বলে দাবী করুক না কেন। এজন্য ইয়াহুদী ধর্মযাজক "আহবার" ও খৃষ্টান ধর্মযাজক "রুহবানের" মধ্যে যারা জ্ঞানী, ন্যায় নীতিবান তাদের একটি গোষ্ঠি তাড়াতাড়ি রাসূল

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান ও ইসলামে প্রবেশের দিকে ধাবিত হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞগণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে তাঁর রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ-কারী অলৌকিক ঘটনাবলী (মুজিযা) গণনা করেছেন। যার পরিমান এক হাজারেরও বেশী। তন্মধ্যেঃ

নবুয়াতের সিলমোহর, যা আল্লাহ তাঁর দুই স্কন্ধের উপর বিদ্ধমান ছিল। সেটি ছিল তিলকের আকৃতিতে। তাতে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল লেখা ছিল।

গরমের মৌসুমে উত্তপ্ত সূর্যের মধ্যে হাঁটার সময় তাঁকে মেঘের ছায়া দান।

তাঁর হাতের মধ্যে অবস্থিত পাথরের তাসবীহ পাঠ ও তাঁর প্রতি বৃক্ষের সালাম দান।

শেষ যুগে যা অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে তার গায়েবী বাণী। তিনি যে ভাবেই বলেছেন তদনুরুপ একের পর এক এগুলো অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো ঐ সমস্ত অদৃশ্য জিনিষ যা তাঁর তিরোধানের পর থেকে নিয়ে দুনিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁকে জানায়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনিও সেগুলো বর্ণনা করেছেন। এর সব গুলোই হাদীস গ্রন্থে ও কিয়ামতের আলামত সম্বলিত গ্রন্থে লেখা রয়েছে। এ বিষয়ে ইবনি কাছির প্রণীত 'আন নিহায়াহ' ও 'আল আখবারুল মুশায়া ফী আশরাতিচ্ছায়া' (কিয়ামতের

আলামত সম্পর্কে বর্ণিত তথ্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ ও হাদীস গ্রন্থের ফিতান ও মালাহিম অধ্যায় সমূহ দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত অলৌকিক নিদর্শনাবলী তার পূর্ববর্তী নবীগণের অলৌকিক নিদর্শনাবলীরই অনুরূপ, তবে তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞানসম্মত অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন যা যুগের ইতিহাসে দুনিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যা আল্লাহ অন্য নবীদের কাউকে দান করেন নি। সেটি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন (আল্লাহর বাণী), যা রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং কোন রদবদলকারীর হস্ত এদিকে বাড়ালেও কোন কিছু করতে সক্ষম হবেনা। যদি কেউ এক অক্ষর পরিবর্তনের চেষ্টা করে যা আমরা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেও মুসলমানদের হাতে শত শত মিলিয়ন কুরআনের কপিতো অবশিষ্ট রয়েছে যার একটিও অন্যটি থেকে এমনকি একটি অক্ষরও অন্যটির অক্ষর থেকে পার্থক্য নেই। অপরদিকে তাওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য । যার একটি কপি হতে অন্যটি ভিন্ন প্রকারের। কেননা, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে খেলায় মেতেছে এবং তাদের উপরে এদুটোর সংরক্ষনের দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা একে রদবদল করে ছেড়েছে। অপর দিকে আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বে অন্য কাউকে নিয়োজিত না করে নিজেই নিজের উপরে দায়িত্ব রেখেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

"নিশ্চয় আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী"। (হিজর-৯)

নিশ্চয় আল-কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। এ সম্পর্কে জ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও আল্লাহর বাণী থেকে দলীলাদিঃ

কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল; এ সম্পর্কে (জ্ঞান সম্মত) প্রমাণাদির মধ্যে অন্যতম প্রমাণ এটি যে পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উম্মতদের মত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফির কুরাইশদেরকে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন। তারা বলেছিলঃ কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। আল্লাহ তার সমতুল্য কিছু রচনার জন্য তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন। কুরআন তাদেরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সর্ব শ্রেষ্ট বিশুদ্ধভাষী ও তাদের মধ্যে বড় বড় বাগ্মী বক্তা, অলংকার শাস্ত্রবিদ ও তুখোড় কবি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা এর মত কিছু আনতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর এটির মত দশটি সূরা রচনার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়। তারা এতেও ব্যর্থ হয়। অতঃপর একটি মাত্র সূরা আনার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়, তারা তাতেও ব্যর্থ হয়। এরপর সমগ্র জিন্ন ও মানুষ একে অপরের সহযোগী হলেও এর

সমমানের কিছু আনতে তারা যে ব্যর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তার স্পষ্ট ঘোষনা দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

"তুমি বল যদি সকল মানুষও জিন্ন এই কুরআনের অনুরূপ আনার জন্য একত্রিত হয়। যদিও একে আপরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ কিছুই আনতে সক্ষম হবেনা"। (বণী ইসরাইল-৮৮)

যদি কুরআন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কোন মানুষের বাণী হত তা হলে সে ছাড়া তাঁর ভাষাভাষী অন্য শুদ্ধ বাগ্মী, এর অনুরূপ আনতে সমর্থ্য হত। কিন্তু এটি আল্লাহর বাণী। মানুষের বাণীর তুলনায় আল্লাহর বাণীর মর্যাদা ও মান তেমন সমুচ্চে যেমন সমুচ্চে তাঁর সত্তা মানুষেরসত্তা থেকে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। এ দ্বারাই পরিষ্কার যে, নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম) তাঁর রাসূল। কেননা, আল্লাহর বাণী তাঁর পক্ষ থেকে পাঠান যা রাসূলের মাধ্যম ছাড়া অবতীর্ণ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী"। (আহযাব-৪০)আল্লাহ বলেনঃ-

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের কাছে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরন করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানেনা"। (সাবা-২৮)
আল্লাহ বলেনঃ-

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"এবং আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরন করেছি"। (আম্বিয়া-১০৭)

আয়াত সমূহের সারমর্ম হচ্ছে- প্রথম আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র মানব জাতির নিকটে তার রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী নেই। তাঁকে তিনি সর্বশেষ রাসূল হিসাবে রিসালাত বহনকারী মনোনীত করেছেন। কেননা, তিনি জানেন, এ বিষয়ে তিনিই (মুহাম্মদ) হচ্ছেন যোগ্য ব্যক্তি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাদা কালো আরব-অনারব সকল মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয় অধিকাংশ মানুষই সত্যকে জানেনা। সে জন্য তারা পথভ্রষ্ট। তারা মুহাম্মদ এর অনুসরন না করে কাফির হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করেন ও বলেন, নিশ্চয় তিনি তাকে নিখিল বিশ্বর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর রহমত যাদ্বারা মানবকে মর্যাদাবান করা হয়েছে। অতঃপর যে তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে অনুসরন করবে সে তার রহমতকে গ্রহণ করল। তার জন্য বেহেস্ত অবধারিত। আর যে মুহাম্মদ এর উপর ঈমান আনবেনা, তাঁকে অনুসরন করবে না সে আল্লাহর রহমতকে ফিরিয়ে দিল। সে দোযখের কঠোর শাস্তির হকদার হল।

আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান।

হে জ্ঞানবান, আমরা আপনাকে রব হিসেবে আল্লাহর উপরে ঈমান, রাসূল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনার দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। তার অনুসরন করা তার মাধ্যমে যে শরীয়ত আল্লাহ পাঠিয়েছেন তদানুসারে আমল করার দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। সেটিই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, যার উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন (আল্লাহর বাণী) ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সমূহ যা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, তিনি ভুলত্রুটিমুক্ত। তিনি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন নির্দেশ দেননি এবং আল্লাহর নিষেধ ছাড়া কোন কিছু নিষেধ ও করেননি। সুতরাং একাগ্র মননিয়ে বলুন- "একক ইলাহকে রব জেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম" "রাসূল মেনে নিয়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমি তাঁকে অনুসরন করব।" কেননা, এর মাধ্যম ছাড়া আপনার কোন মুক্তি নেই।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে সৌভাগ্যবান হওয়ার ও মুক্তির তাওফীক দান করুন। (আমীন)

তৃতীয় অধ্যায়

সত্য দ্বীন (ইসলাম) সম্পর্কে জ্ঞান

হে জ্ঞানবান, আপনি যখন জেনেছেন যে, আল্লাহই আপনার রব যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আপনাকে রিযক দান করেন, তিনি এক ও সত্যিকারের ইলাহ (উপাস্য) যার কোন অংশীদার নেই। একক তাঁরই ইবাদত করা আপনার প্রতি ওয়াজিব। এবং আরো জেনেছেন নিশ্চয় মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার নিকটে ও সমগ্র মানুষের নিকটে আল্লাহর রাসূল, প্রেরীত পুরুষ।

অতঃপর জানুন, দ্বীন ইসলামকে জানা তার উপর ঈমান আনা ও সে অনুযায়ী আমল করা ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর উপরে সঠিক ঈমান আনা সম্ভব হবেনা। কেননা এটি এ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) যা আল্লাহ অনুমোদিত, যার নির্দেশ তিনি তাঁর রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যা দিয়ে তাদের শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমগ্র মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তার উপরে আমল করাকে ওয়াজিব করেছেন।

ইসলামের সংজ্ঞা

সর্বশেষ রাসূল ও সমগ্র মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরীত পুরুষ মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

« الاسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً »

"ইসলাম হচ্ছে- তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমজানের রোযা আদায় করবে। রাস্তা অতিক্রমে সামর্থ্যবান হলে কাবার হজ্ব আদায় করবে"। মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম ঐ আন্তর্জাতিক দ্বীন, যাকে গ্রহণের জন্য সমগ্র মানুষদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সকল রাসূলগণ এই দ্বীনের উপরে ঈমান এনেছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই দ্বীন গ্রহণের ঘোষনা দিয়েছেন। আল্লাহও ঘোষনা দিয়েছেন যে, এটিই সত্য দ্বীন এবং এই দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনকে তিনি কারো থেকে গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেনঃ- إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীনই হচ্ছে ইসলাম"

(আল-ইমরান-১৯)

আল্লাহ বলেনঃ-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনকে অনুসন্ধান করে তাথেকে তা গ্রহণ করা হবেনা। এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আল-ইমরান-৮৫)

আয়াত দু'টির মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, ইসলামই হচ্ছে তাঁর নিকটে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় আয়াতে বলেছেন- ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তিনি কবুল করবেন না। এবং শুধু মুসলমানেরাই মৃত্যুর পরে সৌভাগ্যবান হবেন। এবং যারা ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে তারা আখেরাতে ক্ষতি গ্রস্থ হবে ও দোযখে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এজন্য সকল নবীগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের ইসলামের ঘোষণা দিয়েছেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না। তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ও ঘোষনা দিয়েছেন। সুতরাং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ পেতে ও সৌভাগ্যবান হতে চায়, তাদের ইসলামকেই গ্রহণ করা উচিৎ এবং রাসূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী হওয়া উচিৎ, যাতে তারা সত্যিকার অর্থে

মূসা, ঈসা (আঃ) এর অনুসারী বলে গণ্য হয়। কেননা, হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ঈসা (আঃ) সকলেই আল্লাহর রাসূল, সকলেই মুসলমান। সকলেই ইসলামের দিকে মানুষদের ডেকেছেন। কেননা, এটিই আল্লাহর দ্বীন যা সহকারে তিনি তাদের সকলকেই পাঠিয়েছেন। কারো জন্য এটা সঠিক নহে যে, সে সর্বশেষ রাসূল প্রেরনের পরে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত তার উপরে ঈমান ব্যতীত সে নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী করবে। কেননা, এ দাবী তখনই গ্রহণ করা হবে যখন সে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর পক্ষ হতে পাঠানো রাসূল বলে ঈমান আনবে, তাঁর অনুসরন করবে এবং তার উপরে অবতীর্ণ কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন ঃ

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরন কর। (তাহলে) আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের পাপকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" আ'লি-ইমরান-৩১)

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে- যে আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে তাকে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই বলতে নির্দেশ

দিয়েছেন যে, সত্যিকারে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরন কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। কেননা, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনবে ও তাকে অনুসরন করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন না, তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন না। রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে নিখিল মানুষের কাছে যে ইসলাম পাঠান হয়েছে তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ও ক্ষমাসুন্দর ইসলাম যাকে আল্লাহ পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি তার বান্দাদের জন্য এটাকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। তাদের থেকে তিনি সেই দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীন গ্রহণ করবেন না। তিনি এ সম্পর্কে সকল নবী ও ইসলামের প্রতি যারা ঈমান এনেছেন তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমি আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ করলাম। এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" (মায়িদা-৩)

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে- রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের সাথে বিদায় হজ্জের সময় মক্কার আরাফাতে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহকে মনে মনে ও উচ্চস্বরে ডাকছিলেন। তখন আল্লাহ তার শেষ নবী

মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। এটি ছিল রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শেষ জীবনে, যখন তাকে তিনি সাহায্য করেছেন, ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে, কুরআন অবতীর্ণ পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন- তিনি নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠানো ও তাঁর উপরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি তাদের দ্বীন ইসলামের উপরে সন্তুষ্ট রয়েছেন। এর উপরে তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হননা। তিনি আরো জানাচ্ছেন- নিশ্চয় তাঁর রাসূল এর মাধ্যমে সমগ্র মানুষের জন্য প্রেরীত ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা সকল যুগে, সকল স্থানে, সকল উম্মতদের জন্য উপযোগী। এটি বিজ্ঞান ভিত্তিক, সহজ সরল, ন্যায় সংগত, মংগলময় জীবন ব্যবস্থা। এর পদ্ধতি অতি পরিচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ। জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী। ধর্মনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিচারনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি ও মানুষেরা তাদের পার্থিব জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন অনুভব করে এর মধ্যে এসবের সঠিক পদ্ধতি নিহিত রয়েছে। এর মধ্যেই মানুষের মৃত্যুর পরের পার-লৌকিক জীবনের মংগল বিদ্যমান রয়েছে।

ইসলামের স্তম্ভ সমূহ (আরকান)

পরিপূর্ণ যে ইসলাম সহকারে আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন তা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১] এ গুলোর প্রতি ঈমান আনা ও যথাযথ পালন করা ছাড়া কেউ সত্যিকারের মুসলমান হয় না। সে গুলো হচ্ছে- ১- নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল,- এই সাক্ষ্য দেওয়া।

২- নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৩- যাকাত প্রদান করা।

৪- রমজানের রোজা আদায় করা।

৫- রাস্তা অতিক্রমের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ তে হজ্জ আদায় করা। ?

নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন এলাহ নেই ও নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের বিশেষ অর্থ রয়েছে, যা মুসলমানকে জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

১- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পাঁচটি জিনিষের উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ও নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমজানে রোজা আদায় করা, বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা। (বুখারী মুসলিম)।

কুরআনের প্রমাণাদি আরকান সমূহকে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করার সময় আলোচিত হবে।

কেননা, যে শুধু মুখে উচ্চারণ করে ও অর্থ জানে না, এবং তত অনুযায়ী আমল করে না সে এর দ্বারা কোন লাভবান হয় না। لا إله إلا الله এর অর্থ হচ্ছে, আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনিই সত্যিকারের ইলাহ, তিনি ব্যতীত সকল ইলাহই বাতিল

إله এর অর্থ হচ্ছে, মাবুদ (যার ইবাদাত করা হয়) যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করে সে আল্লাহকে অস্বীকার করল ও তার সাথে অন্যকে অংশীদার বানালো, যদিও তার এই মাবুদ নবী ও ওলী হোক না কেন। যদিও এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া ও তাদেরকে ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হোক না কেন। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তারা তাদের নবী ও ওলীদের এই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতেই ইবাদাত করত। কেননা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া এবং এ গুলোকে ওয়াসীলা গ্রহণের নামে ইবাদাত, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে না। এবং আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী এবং আমাদের নামায, দান, যিকর, রোযা, জিহাদ, হজ্জ, মাতা পিতার প্রতি ভাল ব্যবহার প্রভৃতি নির্দেশিত উত্তম কাজ সমূহ ও সম্মুখে উপস্থিত জীবিত মুমিন যদি তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, তাহলে সে দোয়াকে ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

ইবাদাতের অসংখ্য প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে দোয়া অন্যতম। দোয়া হচ্ছে- এমন কিছু প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানানো, যা পূরণ করার সামর্থ্য আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। যেমন, বৃষ্টি দান, রোগীর আরোগ্য, যে বিপদ আপদ কোন সৃষ্টজীব দূর করতে সক্ষম নহে তা দূর করান, বেহেশত ও দোযখ থেকে মুক্তি চাওয়া, সন্তান সন্ততি, রিযক, কল্যাণ প্রভৃতি চাওয়া। এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না। যদি কেউ মৃত হোক বা জীবিত হোক কোন সৃষ্টি জীবের কাছে এগুলো থেকে কিছু চায় তাহলে সে তার ইবাদাত করল। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তার নিকটেই দো'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটিও বলে দিয়েছেন যে, দো'আ ইবাদাত এবং দো'আকে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যমুখী করবে সে জাহান্নামী।

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"

"তোমাদের রব বলেছেন যে, আমার কাছে দো'আ কর। আমি তোমাদের থেকে তা গ্রহণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত সম্পর্কে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে"। (আল-মুমিন-৬০)
আল্লাহ আরো বলেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য যাদের কাছে দো'আ করা হয় তারা নবী অথবা ওলী বাঈ

হোক না কেন, অন্যের লাভ বা ক্ষতির কোন কিছুই তারা করতে পারে না।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

"বল, তাঁকে তোমরা যাকে (মাবুদ) দাবী করছ, তাদেরকে আহ্বান কর অথচ তারাতো তোমাদের কষ্ট দুর করা ও অবস্থা পরিবর্তনের যোগ্যতা রাখে না"। বণী ইসরাইলে ৫৬ নং ও তার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ আল্লাহর জন্য (নির্ধারিত)"। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্যকে ডেকো না। (জিন্ন-১৮) ইবাদাতের মধ্যে জবহ, মানত ও কুরবাণী পেশ ও রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য কোন মানুষ একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য পশুর রক্ত প্রবাহিত করবে না। কুরবাণী পেশ করবেনা। কোন কিছু মানত করবে না। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যেমন কবর অথবা জ্বিন্নের উদ্দেশ্যে জবহ করল সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইবাদাত করল এবং আল্লাহর অভিসম্পাতের অধিকারী হল। আল্লাহ তা'আলা বলছেন-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ الانعام

"তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী আমার জীবন, আমার মৃত্যু, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এ কাজেরই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্ম সমাপনকারীদের মধ্যে প্রথম"। (আল-আনআম-১৬২,১৬৩)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন...

لعن الله من ذبح لغير الله

"যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবেহ করে তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন"। হুহীহ হাদীস মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ এই বলে মানত করলে যে, যদি আমি এই এই অর্জন করি তাহলে জনৈকের উদ্দেশ্যে অথবা জনৈক কবরের উদ্দেশ্যে এই পরিমান দান করব। তবে এই মানত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটি সৃষ্টের উদ্দেশ্যে মানত করা হয়েছে। মানত ইবাদাত। আল্লাহ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে এটি বৈধ নয়। শরীয়ত সম্মত মানত হচ্ছে- আমি যদি উমুক জিনিষ প্রাপ্ত হই তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উমুক মাল দান করব, অথবা উমুক ভাল কাজ করার মানত করছি। বিপদমুক্তি কামনা করা, সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করাও ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে বিপদ মুক্তির কামনা করা,

সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় না। কুরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

" إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " الفاتحة : ٤.

"আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদাত করি, ও একমাত্র আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি" (ফাতিহা-৪)

আল্লাহ বলেন-

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "

"তুমি বলঃ আমি প্রভাতের রবের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (ফালাক-১,২)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

« إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث با لله ، إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن با لله »

"আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যায়না সাহায্য প্রার্থনা করা যায় একমাত্র আল্লাহর কাছে।"

"যখন কিছু চাও আল্লাহর কাছে চাও, যখন সাহায্য প্রার্থনা কর, আল্লাহর কাছেই কর।" ছহীহ হাদীস। তিরমিযী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। জীবিত উপস্থিত মানুষের নিকটে সে যা করতে সামর্থ্য রাখে, এমন বিষয়ে বিপদ মুক্তির আহ্বান ও সাহায্য চাওয়া বৈধ। তবে আশ্রয় প্রার্থনা কোন অবস্থাতে একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। কোন মৃত ও অনুপস্থিত কারো কাছে বিপদে মুক্তির আহবান ও সাহায্য প্রার্থনা কখনো ঠিক নহে। কেননা তিনি নবী অথবা ওলী অথবা ফিরিশতা যাই হউন না কেন বিপদ

মুক্তির যোগ্যতা রাখেন না। গায়িব (অদৃশ্য) আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না, যে গায়িব জানার দাবী করে সে কাফির। তাকে মিথ্যাবাদী বলা ওয়াজিব। গণকের গণনা করার পরে যদি সত্যিকারে তেমনি কিছু ঘটে যায় তা কাকতালীয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ-

من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

"যে ব্যক্তি গণক ঠাকুরের অথবা ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে এল এবং সে যা বলল বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে অবতীর্ণকৃত সব কিছুকে অস্বীকার করল।" ইমাম আহমদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। ভরসা করা, পাওয়ার আশা, বিনয় অবনত হওয়া ও ইবাদাতের অন্তর্গত। সুতরাং মানুষ একক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে কিছু পাওয়ার আশা করবে না। আল্লাহর কাছে ছাড়া বিনয়, অবনত হবে না।

দুঃখের বিষয় যে, অন্যকে ইসলামধারীরা আল্লাহ্ ব্যতীত অনেক শ্রেষ্ট জ্ঞান করে অনেক জীবিত অথবা অনেক কবরবাসীর কাছে দোয়া করার মধ্য দিয়ে শিরক করে। তাদের কবরকে প্রদক্ষিণ করে। তাদের কাছে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা জানায়। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যেরই ইবাদাত। এইরূপ কাজ যারা করে তারা মুসলমানের দাবী করলেও, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ

(সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর রাসূল বললেও, নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও, আল্লাহর ঘরে হজ্ব করলেও তারা মুসলমান নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

"তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকটে ওহী পাঠানো হয়েছিল। যদি তুমি শিরক কর, তোমার কর্ম বৃথা যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (যুমার-৬৫)

আল্লাহ বলেনঃ- إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"প্রকৃত বিষয় এই যে, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য বেহেশত হারাম করেছেন। দোযখ তার আবাসস্থল। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (মায়িদা-৭২)

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি মানুষদেরকে বলেন-

"তুমি বলঃ আমি তোমাদের মত একজন মানুষ তবে আমার কাছে ওহী পাঠান হয় (এই মর্মে) যে, নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ হচ্ছে একই ইলাহ। অতঃপর যে

তার সৎ কাজ করা এবং তার রবের সাথে অন্য কাউকে ইবাদাতে শিরক না করা উচিত।" (কাহাফ-১১০)

তারা সবাই মুর্খ তাদেরকে এ পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট আলেমগণ ধোকা দিয়েছে, যারা দ্বীনের কিছু শাখা প্রশাখা সম্পর্কে জানলেও দ্বীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েগেছে। তারা তাদেরকে তাওহীদের অর্থ সম্পর্কে মুর্খ থাকার কারণে শাফায়াত ও ওয়াসীলার নামে শিরকের দিকে আহ্বান জানায়। তাদের প্রমাণাদি হচ্ছে; কিছু আয়াত সমূহের ভুল ব্যাখ্যা ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে প্রণীত নূতন পূরাতন মিথ্যা হাদীস সমূহ, বিভিন্ন ঘটনাবলী ও শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত স্বপ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার পথ ভ্রষ্টতা; যা তারা তাদের পুস্তক সমূহে সন্নিবেশিত করেছে। এটা এজন্য যে, প্রথম যুগের মুশরীকদের মত তারা দাদা পিতাদের অন্ধ অনুকরন করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তি (অবৈধ খেয়াল খুশী) ও শয়তানের অনুসরন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের যে ইবাদাত তারা করছে; এ সমস্ত মিথ্যা প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কৃতকর্মকে সমর্থনপুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে ওয়াসীলাকে অনুসন্ধান করার জন্য আল্লাহ তার বাণী-

وابتغوا إليه الوسيلة

"এবং তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াসীলা অন্বেষণ কর।" (মায়িদা-৩৫) এতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে- সৎ কাজ যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, নামায আদায় করা, দান করা, রোযা পালন, হজ্জ আদায়,

জিহাদ, ভাল কাজের নির্দেশ দান ও খারাপ কাজের নিষিদ্ধতা ঘোষণা, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা প্রভৃতিকে অন্যধারায় প্রবাহিত করেছে। পক্ষান্তরে মৃতদের উদ্দেশ্যে দোয়া করা বিপদে আপদ ও মছীবতের সময় তাদের কাছে বিপদমুক্তি চাওয়া এটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃতদের ইবাদাতেরই অন্তর্ভুক্ত (ওয়াসীলার সাথে এর সম্পর্ক নেই)।

নবী ও আউলিয়া ছাড়াও মুসলমানদের ও আল্লাহ যে সুপারিশের অনুমতি দিবেন এটি সত্য। এর উপরে আমরা ঈমান আনব। মৃতের নিকটে কিছু চাইব না। কেননা শাফায়াত আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। তার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসীগণ একমাত্র আল্লাহর কাছেই এ বিষয়ে এই বলে দোয়া চায় যে, হে আল্লাহ, আপনার রাসূল ও আপনার সৎ বান্দাদের আমার শাফায়াতকারী নির্ধারণ করুন। তারা এটি বলেন না যে, হে জনৈক আমার জন্য শাফায়াত করুন। কেননা সে মৃত। আর মৃতের কাছে কক্ষনো কিছু চাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন- قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

"তুমি বলঃ সকল প্রকার শাফায়াত আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আসমান জমিনের একচ্ছত্র রাজত্ব তাঁরই। অতঃপর তাঁরই দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" (যুমার-৪৪)

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ছহীহ সুনান গ্রন্থে সংকলিত ছহীহ হাদীস সমূহে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিষেধকৃত ইসলাম বিরোধী বিদায়াত সমূহের মধ্যে অন্যতম বিদায়াত এই যে, কবরকে মসজিদে রূপান্তর করা, কবরে বাতি দেওয়া, কবরের উপরে ঘর তৈরী, কবর গাঁথা, কবরের উপরে লেখা, কবরে পর্দা চড়ানো, কবরস্থানে নামায আদায় প্রভৃতি। এগুলোকে রাসূল নিষেধ করেছেন। কেননা এগুলো কবরবাসীকে ইবাদাত করারই নামান্তর। এদ্বারা পরিষ্কার হয়েছে যে, অনেক দেশে কবরে যেমন মিসরের বাদবী ও যায়নাব এর কবরে, ইরাকে জিলানীর কবর, কারবালা ও নজদের আহলি বাইতের দিকে সম্পৃক্ত কবর সমূহে ও অন্যান্য কবর সমূহে মুর্খরা যা করছে, তা আল্লাহর সাথে শিরক করার শামিল। ঠিক এরই অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবরকে যে তাওয়াফ করা হয়, কবরবাসীর কাছে প্রয়োজনীয় জিনিষ চাওয়া হয়, তাদেরকে ভাল মন্দ করার যোগ্যতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়, প্রভৃতি। তারা মুসলমান দাবী করলেও, নামায পড়লেও, রোযা রাখলেও আল্লাহর ঘরে হজ্ব করলেও, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল, একথা উচ্চারণ করলেও তাদের উপরোল্লিখিত কাজ প্রমাণ করে তারা পথ ভ্রষ্ট মুশরিক। কেননা আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রসূল; এটাকে মুখে উচ্চারণ করলেই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া যায় না। যতক্ষণ না সে এর

অর্থ জানে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, এটি হল মুসলমানদের ক্ষেত্রে অপর দিকে অমুসলিম প্রথমতঃ এই বাক্য উচ্চারনের মাধ্যমেই ইসলামে প্রবেশ করে ও তাকে মুসলমান বলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ এটার পরিপন্থী কোন কিছু তা থেকে প্রকাশ না পায় যেমন- পূর্বোল্লেখিত শিরকী কাজ সমূহ। অথবা যতক্ষণ না ইসলামের ফরজ কাজ সমূহ তার কাছে বললে সে সেটাকে অস্বীকার করে। অথবা ইসলাম বিরোধী কোন দ্বীনের প্রতি ঈমান আনে। নবী ওলীগণ [১] যারা তাদেরকে ডাকে তাদের থেকে বিপদে মুক্তি চায়, তাঁরা তাদের থেকে সম্পর্কহীন। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষদের কে একমাত্র তারই ইবাদাত করা ও নবী ওলী ও অন্যান্যদের ইবাদাত পরিত্যাগের জন্য রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। রাসূল ও তাঁর অনুসারী ওলীদের ভালবাসার অর্থ তাদের ইবাদাত করা নয়। কেননা তাদের ইবাদাত তাদের সাথে শত্রুতার নামান্তর। বরং

(১) ওলী আল্লাহ হচ্ছেন, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তার অনুগত, তার রাসূলের অনুসারী। তন্মধ্যে কেউ কেউ তার ইলম ও অধ্যাবসায়ের কারণে পরিচিতি লাভ করেন কেউ কেউ পরিচিতি লাভ করেন না। পরিচিত জন মানুষ তাদেরকে সম্মান করুক তারা তা চায় না। সত্যিকারের ওলীরা নিজেদের ওলী বলে দাবী করে না। বরং তারা অপরাধী হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোন কাপড় বা সাজ সরঞ্জাম নেই। প্রত্যেক আল্লাহর একত্ববাদী মুসলিম, ও তার রাসূলের অনুসারী তার যোগ্যতা ও আনুগত্যের মাপকাঠি অনুযায়ী সে আল্লাহর ওলীর অন্তর্ভুক্ত। এরদ্বারা পরিষ্কার হল যে, যারা নিজেদেরকে ওলী বলে দাবী করে লোকে তাদের বড় ভাববে ও সম্মান দেখাবে বলে তারা নির্ধারিত কাপড় ও পড়ে, তারা আল্লাহর ওলী নয়, তারা মিথ্যাবাদী।

তাদের ভালবাসা তাদের অনুসরন এবং তাদের পথে চলারই নাম। সত্যিকারের মুসলমান নবী ও ওলীদেরকে ভাল বাসেন তাদের ইবাদাত করেন না। আমরা ঈমান আনব যে, নিজেদের জান, পরিবার, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলকে অধিক ভালবাসা আমাদের প্রতি ওয়াজিব।

মুক্তি প্রাপ্ত দল

সংখ্যায় মুসলমানেরা অনেক। তবে, আসলে কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম। যে সব দলকে ইসলামী দল বলে মনে করা হয় তাদের সংখ্যা ৭৩ টি। এ সমস্ত দলের লোকদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। কিন্তু সঠিক মুসলমানের দল হচ্ছে একটি। তারা হচ্ছে, যারা আল্লাহকে এক জানে। এবং আকীদাহ ও সৎ কাজ করার ক্ষেত্রে রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের পদাংক অনুসারে চলে। যেমন রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، افترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قال الصحابة : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي .

"ইয়াহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে। খৃষ্টানেরা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে। এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এবং একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল, সেটি কোন দল? তিনি বললেন, তারা হচ্ছে আমি ও আমার ছাহাবী যে পথে রয়েছি; এই পথে যারা থাকবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীগণ যে আকীদার পথে ছিলেন তা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল। একক আল্লাহর নিকটে দোয়া করা,

আল্লাহর উদ্দেশ্যেই জবহ ও মান্নত করা, একমাত্র আল্লাহরই কাছে বিপদ মুক্তি কামনা করা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ভালমন্দ একমাত্র তিনিই করতে পারেন; এই আকীদা পোষন করা। আর আল্লাহ সুবহানাহুর উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে ইসলামের ভক্ত (আরকান) আদায় করা। ফিরিশতাগণ, কিতাব সমূহ রাসূলগণ, পুনরুত্থান, হিসাব কিতাব, বেহেশত, দোযখ, ভালমন্দ সকল তাকদীরই আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাকে বিশ্বাস করা। সকল ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। এ দুয়ের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর ওলীদের সাথে বন্ধুত্ব ও তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখা। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো, তার রাস্তায় এক হয়ে জিহাদ করা। মুসলমানের নেতাদের সৎকাজের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য দেখান ও যেখানেই অবস্থান করা হউক না কেন সত্য কথা বলা। রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার ও পরিজন এবং রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবীগণকে ভালবাসা। তাদের মর্যাদা অনুযায়ী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঝগড়া সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকা। কিছু মুনাফিক তাদেরকে যে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে তা বিশ্বাস না করা। তাদের এই সমালোচনা ছিল মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং কিছু সংখ্যক আলিম ও ঐতিহাসিক -

দেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। হয়ত বা তারা পুস্তকাদিতে ভাল নিয়তে সাহাবীদের পারস্পারিক এই ঝগড়াকে উল্লেখ করেছে। বস্তুতঃ এটি ঠিক নহে। যারা দাবী করে যে, তারা আহলে বাইতের এবং তারা নিজেরকে 'সাইয়্যিদ' বলে আখ্যায়িত করে, তাদের উচিৎ এই বংশ পরম্পরা সম্পর্কে সঠিক তথ্য অর্জন করা। কেননা নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে সম্বন্ধকারী কে অভিশপ্ত দিয়েছেন। যদি তারা আহলে বাইতের বলে প্রমাণিত হয় তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একত্ববাদকে ইখলাছের সাথে গ্রহণ করে, গোনাহ বর্জন করার মাধ্যমে, নিজেদের সামনে মানুষের মাথা নত করা ও হাতে পায় চুমু খাওয়ার প্রতি খুশী না হয়ে এবং মুসলমান ভাইদের ছেড়ে ভিন্ন কোন পোশাক পরিধান না করে আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার পরিজনের অনুসরন করা উচিৎ। কেননা, এ কাজ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথের পরিপন্থী। তিনি এদের সাথে সম্পর্কহীন, আল্লাহর কাছে সেই মর্যাদার অধিকারী, যে যত বেশী তাকওয়ার অধিকারী।

হে আল্লাহ, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপরে দরূদ ও ছালাম পৌঁছে দিন। (আমীন)

নির্দেশ প্রদান ও শরীয়ত (জীবন পদ্ধতি) প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই সংরক্ষিত।

আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং এর অন্য এক অর্থ রয়েছে যার উপরে ঈমান আনা ও আমল করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, নির্দেশ দান ও শরীয়ত প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। ঠিক তেমনি আল্লাহ কর্তৃক কোন আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর বিচার ব্যবস্থার পরিপন্থী বিচার ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকা ও আল্লাহ কর্তৃক হারাম কৃত কে হালাল ও হালাল কৃতকে হারাম করাও কারো জন্য জায়েজ নহে। অতঃপর যে ইচ্ছা করে আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করে অথবা তাঁর বিরোধী শরীয়াতের উপরে সন্তুষ্ট থাকে সে আল্লাহকে অস্বীকার করল। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা কাফির।" (মায়েদা-৪৫)

আল্লাহ যে সমস্ত কাজ দিয়ে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন তা হচ্ছে একত্ববাদের কালেমা

এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করা। এর অর্থ আল্লাহর ইবাদাত করা। সৃষ্টের ইবাদাত ও তাদের শরীয়াত (জীবন পদ্ধতি) এর গন্ডী থেকে বাহির হয়ে একক ও অংশীদারহীন স্রষ্টার শরীয়াতের দিকে মানুষদের ফিরে আসার দাওয়াত দেওয়া।

যিনি গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে মহাগ্রন্থ কুরআন পড়েছেন ও অন্ধ অনুকরন থেকে দূরে অবস্থান করেছেন তিনি পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যা আমরা বললাম সেটাই সঠিক। এবং আরো উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাসী বান্দাহদের করনীয় যে, তারা তাঁর উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার ইবাদাত করবেন। এবং অন্য কারো উদ্দেশ্যে এ থেকে কিছুই নিবেদন করবেন না। তেমনি আল্লাহ সৃষ্টের সাথে নবীদের ও তাদের সাথে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন এই ভাবে যে, তাদের ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সাথে ও তাদের অনুসরন আল্লাহর অনুসরনের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের সাথে দুশমন কাফিরদের সম্পর্ক হবে শত্রুতার সম্পর্ক। কেননা, আল্লাহই তাদের উপরে রাগান্বিত। এবং এর পরেও তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে হবে, তাদের সম্মুখে ইসলামকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে হবে, হতে পারে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। এবং যদি

তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর বিচার ফয়সালা মানতে রাজী না হয় তাহলে যাতে ফিতনা অনুষ্ঠিত না হয়ে, সকল দ্বীন আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হয় সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জেহাদ করতে হবে। এটাই হচ্ছে কালিমাতুত তাওহীদ:

لا إله إلا الله

এর অন্যতম অর্থ। প্রত্যেক মুসলমানের উপরে সঠিক মুসলমান হওয়ার জন্য এটাকে জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের অর্থ

নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে আপনি জানবেন ও এই আকিদা (বিশ্বাস) পোষন করবেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তিনি বান্দাহ, উপাস্য নন। তিনি রাসূল, মিথ্যা বলেন না, আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য ও অনুসরনীয়। যে তার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে তার, নাফরমানী করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আপনি জানবেন ও বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইবাদাত হোক বিচার পদ্ধতি হোক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়ম পদ্ধতি হোক, অথবা হালাল, হারাম নির্ধারণ সম্পর্কিত, হোক, আপনি কোন শরীয়াতই গ্রহণ করতে পারবেন না, যতক্ষন না তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর শরীয়াত প্রচারক। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কোন পথে আনা শরীয়াত গ্রহণ করা জায়েজ নহে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ, তারা তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত পারস্পারিক ঝগড়ার বিষয়ে তোমাকে বিচারক মানা এবং যা তুমি ফয়সালা দিবে সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সংকোচন পাওয়া না যাওয়া এবং পূর্ণাংগ ভাবে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তারা মুমিন হবে না" । (সূরা নিসা- ৬৫)

আয়াত দুটির অর্থ হচ্ছে- প্রথম আয়াত টিতে আল্লাহ মুসলমানদের তার রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যত নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করতে ও যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হুকুম দিয়েছেন। কেননা তিনি আল্লাহর নির্দেশেই নির্দেশ দেন ও তার নিষেধেই নিষেধ করেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজে স্বয়ং নিজের শপথ করে বলেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনার দাবী ততক্ষণ সঠিক হবে না, যতক্ষণ তাদের পারস্পারিক বিবাদ বিসম্বাদে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিচারক না মেনে নিবে। এবং তাঁর ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট হবে ও পূর্ণ ভাবে তা গ্রহণ করবে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .

যে কেউ এমন কিছু করবে যার উপরে আমাদের সম্মতি নেই তা অগ্রহণযোগ্য, (মুসলিম ও অন্যান্যহাদীস গ্রন্থে বর্ণিত)

"আহ্বান"

হে জ্ঞানবান, যখন আপনি
এর অর্থ জেনেছেন এবং আরো জেনেছেন যে, এই সাক্ষ্যই হচ্ছে ইসলামের চাবী, এবং মূল ভিত্তি; যার উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিশুদ্ধ মন নিয়ে বলুন-

أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً رسول الله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি।" নিশ্চয় মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। দুনিয়া ও আখেরাতে মংগল লাভের জন্য ও মৃত্যুর পরে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এই সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করুন। এবং জেনে নিন, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য দানের অনিবার্য দাবীই হচ্ছে, ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভের উপরেও আমল করা। কেননা আল্লাহ এই সকল স্তম্ভকে তাঁর উদ্দেশ্যেই ইখলাছের সাথে পালনের মধ্যমে তাকে ইবাদাত করা ফরজ করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কোন এক স্তম্ভকে শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া পরিত্যাগ করল সে

لا إله إلا الله এর দাবীকে অপূর্ণ রাখল। সুতরাং তার এই সাক্ষ্য সঠিক বলে বিবেচিত হবে ন।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ
নামাজ

হে জ্ঞানবান, জেনে নিন, ইসলামের স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। রাত দিনে আল্লাহর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ শরীয়াতে রাতদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারণ করেছেন। এই নামাজ অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে রাখবে। এটি তাদের জন্য মানুষিক ও শারীরীক প্রশান্তি, যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণময় করবে। আল্লাহ নামাজের জন্য শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পবিত্র হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং মুসলমান অপবিত্রতা যেমন পেসাব, পায়খানা প্রভৃতি থেকে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবেন, যাতে তার শরীর বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে ও অন্তর আভ্যন্তরীন অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়। নামাজ হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি স্বরূপ। এটি হচ্ছে দুই সাক্ষ্যের পরেই সবচেয়ে গুরুপুর্ণ স্তম্ভ। পূর্নবয়স্ক হওয়ার থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপরে এটাকে পুংখানু ভাবে পালন করা ওয়াজিব। পরিবার পরিজন ও সন্তানের বয়স সাত বছর হতেই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে নামাজের নির্দেশ দেওয়া মুসলমাননের উপরে ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন-

"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় মুমিনের উপরে ফরজ।" (নিসা-১০৩)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

"ইখলাসের সাথে দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে, একমাত্র আল্লাহকে ইবাদাত করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ছাড়া তাদেরকে অন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বস্তুত ইহাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।" (আল-বায়্যিনাহ-৫)

আয়াত দুটির সারমর্ম হচ্ছে- প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, নামাজ মুমিনের উপরে অত্যাবশ্যকীয় ফরজ। নির্ধারিত সময়ে এগুলো আদায় করা ও তাদের উপরে অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন, নিশ্চয় মানুষদেরকে সে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ও যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; তা হচ্ছে একক আল্লাহরই তারা ইবাদাত করবে। তাঁরই উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদাতকে বিশুদ্ধ করবে। নামাজ কায়েম করবে এবং হকদারদেরকে যাকাত প্রদান করবে।

নামাজ সব অবস্থাতেই এমনকি ভীত সন্ত্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থাতেও মুসলমানের উপরে ওয়াজিব। যে কোন অবস্থায় তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী দাঁড়ায়ে বসে শুয়ে, যদি তাও অসম্ভব হয় চোখ অথবা কলবের দ্বারা ইশারা করে তা আদায় করবেন। ইশারার মাধ্যমেও তিনি নামাজ আদায় করবেন, কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ﷺ সাল্লাম) বলেছেন নামাজ পরিত্যাগকারি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক মুসলমান নয়। তিনি বলেন-

العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

"আমাদের ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি তা হচ্ছে নামাজ, যে এটি পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।" (হুহীহ হাদীছ)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হচ্ছে; ফজরের নামাজ, জোহরের নামজ, আছরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ ও ইশার নামাজ। ফজরের নামাজের সময় পূর্বগগনে প্রভাতের রাশ্মি প্রকাশের থেকে শুরু হয় এবং সূর্য উদয়ের সময় শেষ হয়। শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়। জোহরের সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং প্রত্যেক জিনিষের ঢলে যাওয়ার সময়ের ছায়া বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ছায়া তার দৈর্ঘের সমান না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে। আছরের সময় জোহরের পর থেকে শুরু হয় এবং সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয় বরং সূর্য একেবারেই সাদা অবস্থায় থাকতে এটি আদায় করতে হবে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং লাল শাফাক (আবীর রঙে আভা) অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করা ঠিক নয়। আর ইশার নামাজ মাগরিবের নামাজের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় ও অর্ধরাত্র পর্যন্ত থাকে এবং এর পরে আর দেরী করা যায় না। মুসলমান যদি

অনিচ্ছাকৃত শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতিত এক সময়ের নামাজকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে দেরী করেন, তাহলে তিনি বড় পাপে পতিত হলেন। তার উচিৎ আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এর পূণরাবৃত্তি না করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ الماعون : ٤-٦

"যে সকল নামাজীরা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন তাদের জন্যই ধ্বংস (অবধারিত)।" (মাউন-৪,৫)

নামাজের হুকুম আহকাম

প্রথমতঃ পবিত্রতাঃ-

নামাজ আরম্ভ করার পূর্বেই মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অপরিহার্য। সুতরাং প্রথমে বহির্গমন রাস্তা দিয়ে যদি পেশাব পায়খানায় কিছু বাহির হয় তা পরিষ্কার করে পরে ওজু করতে হবে। অজু করতে মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করতে হবে তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ এ সম্পর্কে জানেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য মুখে নিয়ত উচ্চারণ করেননি। অতঃপর কুলি করতে হবে। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করায়ে তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পরে সম্পূর্ণ চেহারা ধৌত করতে হবে। অতঃপর ডান থেকে শুরু করে দুই হাত দুই বাজু সহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ মাথা ও দুইকান দুই হাত দ্বারা স্পর্শ (মসিহ) করতে হবে। অতঃপর ডান থেকে শুরু করে গোড়ালি পর্যন্ত পাও ধৌত করতে হবে। যদি পবিত্রতা অর্জনের পরে পেশাব অথবা পায়খানা অথবা বাতাস বাহির হয় অথবা ঘুম বা অজ্ঞান হওয়ার কারণে জ্ঞান লোপ পায়, তাহলে নামাজ আদায় করতে চাইলে পুনরায় পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। মুসলমান পুরুষ বা মহিলার যৌন উত্তেজনা বশতঃ যদি বীর্যপাত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় হলেও পবিত্রতার জন্য সম্পূর্ণ শরীর পানি দ্বারা ধৌত

করতে হবে। মহিলা যখন হায়িয অথবা নিফাস থেকে পবিত্র হবে, তার সমস্ত শরীর ধৌত করে পবিত্র হতে হবে কেননা হায়িয গ্রস্থা-নিফাস গ্রস্থার নামাজ ঠিক নহে। তার উপরে নামাজ পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ওয়াজিব নহে। আল্লাহ হায়িয ও নিফাস অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া নামাজ কাযার ব্যবস্থা না রেখে তাদের উপরে সহজ করেছেন। নামাজ ছাড়া অন্য যা কিছু এ অবস্থায় তারা করতে সক্ষম হলনি, পুরুষের মত তা কাযা ওয়াজিব। পানির অবর্তমানে অথবা পানি ব্যবহারে রোগাক্রান্ত হতে পারে, এমন রোগাক্রান্ত অবস্থায় তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হচ্ছে, মনে মনে পবিত্রতার নিয়ত করে পরে দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে ও তাদ্বারা মুখমন্ডল মসাহ করতে হবে। অতঃপর ডান হাতের পিঠ বাম হাতের পেট ও বাম হাতের পিঠ ডান হাতের পেট দ্বারা মসাহ করতে হবে। পানি না থাকা বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, হায়িয ও নিফাস গ্রস্থা ও অপবিত্র যারা অজু করতে চায়, এভাবেই তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয়ঃ- নামাজের পদ্ধতি

ফজরের নামাজ দুই রাকায়াত। পুরুষ অথবা মহিলা মুসলমান কিবলাহ মুখী হবেন। কিবলাহ হচ্ছে মক্কার মসজিদে হারামে অবস্থিত কা'বাহ। এবং মনে মনে এই নিয়ত করবেন যে, ফজরের নামাজ আদায় করছি। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করবেন না। অতঃপর (আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ) বলে তাকবীর বলবেন। অতঃপর উদ্বোধনী দোয়া পাঠ করবেন। এর মধ্যে অন্যতম দোয়া হচ্ছে-

" سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى
جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "

"আপনি পবিত্র। হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা দ্বারা, (শুরু করছি) আপনার বরকত, আপনার মর্যাদা সর্বোচ্চ, আপনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই। আপনার কাছে আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" অতঃপর ফাতিহাতুল কুরআন (সূরা ফাতিহাহ) পড়বেন, সেটি হচ্ছে-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

"পরম দাতা ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

পরম দাতা ও পরম দয়ালু। বিচার দিনের বাদশাহ্, আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহার্য্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদের কে সোজা পথ দেখান। তাদের পথ যাদের উপরে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। যাদের পতি আপনি রাগান্বিত নন। যারা পথভ্রষ্ট ও নয়।"

অবশ্যই কুরআন সাধ্যানুযায়ী আরবী ভাষায় পড়বেন।[১] অতঃপর বলবেন "الله اكبر" (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং মাথাও পিঠ নিচু অবস্থায় সমন্তরাল করে হাতদ্বয় দ্বারা হাটু দ্বয়কে আকড়ে ধরে রুকু করবেন। ও বলবেন "سبحان ربي العظيم" "আমার মহান রব অতি পবিত্র"। অতঃপর "سمع الله لمن حمده" "যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন তিনি তা শুনেছেন বলে উঠবেন। সোজা হয়ে দাঁড়াবেন বলবেন ربنا ولك الحمد "হে আমাদের রব আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।" এরপর আল্লাহ আকবার বলবেন এবং তিনি তার পাদ্বয়ের আংগুলের কিনারা, হাটুদ্বয়, হাতদ্বয়, চিহারা ও নাক মাটিতে লাগায়ে সিজদাহ করবেন। অতঃপর সিজদা হতে বলবেন "سبحان ربي الاعلى"

১- কেননা, যদি কুরআন আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় পড়া হয় তাহলে তা কুরআন হয় না। কেননা, কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ হয় না। শব্দাবলীর অর্থের অনুবাদ হয়। কেননা, এর অক্ষর ও শব্দসমূহকে অনুবাদ করা হলে তার অলংকার ও তার চ্যালেঞ্জ অবশিষ্ট থাকে না। এমকি,এর ফলে অক্ষর ও বাদ পড়ে যায়। এবং একে আরবী ভাষায় কুরআন বলা যায় না।

"আমার সর্বোচ্চ রব অতি পবিত্র।" এরপর আল্লাহু আকবার বলে বসবেন এবং বসার সময় "رب اغفر لي" "হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন" বলবেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবেন এবং দ্বিতীয়বার মাটির উপরে সিজদাহ করবেন। এবং বলবেন "سبحان ربي الأعلى" "আমার সর্বোচ্চ রব অতি পবিত্র।" এরপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর পুনরায় প্রথম রাকায়াতের মত ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন শেষ পর্যন্ত পড়বেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবেন। রুকু করবেন রুকু থেকে উঠবেন। সিজদাহ করবেন, এরপর বসবেন, অতঃপর দ্বিতীয় সিজদাহ করবেন এবং এর প্রতিটি জায়গায় প্রথম বার যাহা পড়েছিলেন তাই পড়বেন। অতঃপর বসা অবস্থায় পড়বেন।

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد .

"মৌলিক, শারিরীক ও আর্থিক সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য । হে নবী, আপনার উপরে শান্তি , আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষণ হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপরে ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও

রাসূল। হে আল্লাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার পরিবার পরিজনের উপরে শান্তি বর্ষণ করুন, যেমন বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) ও তার পরিবার পরিজনের উপরে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদার অধিকারী।"

অতঃপর ডান দিকে ফিরবেন এই বলে-

السلام عليكم ورحمة الله

"আপনাদের উপরে শান্তি ও আল্লাহর রহমত (বর্ষিত হোক)।" অতঃপর বাম দিকে ফিরবেন ও বলবেন

السلام عليكم ورحمة الله

"আপনাদের উপরে শান্তি ও আল্লাহর রহমত (বর্ষিত হোক)।" এর মাধ্যমে ফজরের নামাজ পরিপূর্ণ হল। অপরদিকে জোহর আছর ও ইশার নামাজ চার রাকায়াত। ফজরের দুই রাকায়াতের মতই এগুলোর প্রথম দুই রাকায়াত পরিপূর্ণ করবেন, তবে দুই রাকায়াতের পরে যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসবেন ও সালামের পূর্বে যা পড়ার তা পড়বেন এরপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়াবেন। এবং এর পরে প্রথম দুই রাকায়াতের মত আরো দুই রাকায়াত পড়বেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাশাহ্হুদের জন্য বসবেন ও যা প্রথম বৈঠকে পড়েছেন তাই পড়বেন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে দরূদ পড়বেন। এরপর ডান দিকে ও বাম দিকে ফজরের নামাজের মত সালাম ফিরাবেন।

অপরদিকে মাগরিবের নামাজ তিন রাকায়াত যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তেমনি দুই রাকায়াত আদায়

করবেন। অতঃপর বসবেন ও পূর্ব বর্ণিত নামাজ সমূহে যা পড়েছেন তা পড়বেন। তবে সালাম ফিরাবেন না বরং উঠে দাঁড়াবেন। অতঃপর তৃতীয় রাকায়াতে অন্যান্য নামাজের মধ্যে যা পড়েছেন পড়বেন অতঃপর দ্বিতীয় সিজদাহ শেষে (না উঠে) বসবেন ও অন্যান্য নামাজে যা পড়েছেন তাই পড়বেন অতঃপর ডানে বামে সালাম ফিরাবেন। রুকু ও সেজদার দোয়া পুনরাবৃত্তি উত্তম।

পুরুষদের জন্য এই পাঁচ ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব। যার কুরআন পাঠ উত্তম, নামাজ সম্পর্কে বেশী জানেন এবং দ্বীন সম্পর্কে যোগ্য সেই তাদের মধ্যে ইমাম হবেন। ইমাম রুকুর পুর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় ফজরের দুই রাকয়াত ও মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকয়াতে কুরআন স্বর করে পড়বেন এবং তা পিছনের নামাজীরা শুনবেন। মহিলাগণ ঘরে পর্দাও হিফাজত সহকারে নামাজ আদায় করবেন। নিজের সমস্ত শরীর এমনকি দুই হাত দুই পা ও ঢেকে নিবেন, কেননা শুধুমাত্র তার চেহারা ব্যতীত সবই সতর (যা আবৃত করা অত্যাবশ্যক) তাদেরকে পুরুষের থেকে চিহারা ঢাকার নির্দেশ দিতে হবে। কেননা এটার দ্বারা এমন ফিতনা ছড়ায় যা অত্যন্ত মারাত্মক। যদি মুসলমান রমনী মসজিদে নামাজ আদায় করতে চান, কোন বাধা নেই; তবে এই শর্তে যে, পর্দা সহকারে বাহির হবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না, পুরুষের পিছনে নামাজ

আদায় করবেন। যাতে তার পুরুষদের আর পুরুষরা তাদেরকে ফিতনায় ফেলতে না পারেন।

মুসলমানদের উচিৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে অতিব বিনয় অবনতচিত্তে ভীত সন্ত্রস্ত ও হুজুরে ক্বলবের (মনযোগের) সাথে নামাজ আদায় করা, দাঁড়ান, রুকু করা ও সিজ্‌দাহ অত্যন্ত ধীর গতিতে সম্পন্ন করা।

তাড়াতাড়ি করবেন না। অহেতুক কিছু করবেন না। আসমানের দিকে তাকাবেন না। কুরআন পাঠ ব্যতীত কথা বলবেন না।[১] নামাজের যিকর যথার্থ জায়গায় পড়বেন। কেননা আল্লাহ তাঁর সম্মানের জন্যই নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

জুম্মার দিন মুসলমানেরা দুই রাকাত নামাজ আদায় করবেন। ফজরের নামাজের মত ইমাম সাহেব এই উভয় রাকাতেই কুরআন স্বর করে পড়বেন। নামাজের পূর্বে দুইটি খুৎবা (বক্তৃতা) দিবেন। এর মধ্যে মুসলমানদেরকে করনীয় স্মরণ করায়ে দিবেন। তাদেরকে দ্বীনের বিষয়াদি শিক্ষা দিবেন। পুরুষদের জন্য ইমামের সাথে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। জুম্মার দিনে এটিই হচ্ছে জোহরের নামাজ।

(১) তবে যদি কারো সতর্ক করতে চান বা ভুল সংশোধন করতে চান "সুব্‌হানাল্লাহ" বলবেন। এটা শুধু মাত্র মুক্তাদী ইমামকে কিছু ভুল করলে, বেশী করলে, কম করলে সাবধানতার জন্য এবং নামাজী উদাহারণ স্বরূপ কাউকে ডাঁকার জন্য বলতে পারেন। আর মহিলারা সাবধানতার জন্য তালি দিবেন। কথা বলবেন না। কেননা,তাদের স্বরে ফিতনার ভয় থাকে।

যাকাত

ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হলো মালের যাকাত প্রদান করা। প্রত্যেক মুসলমান যারা নির্ধারিত নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি বছর তাদের মাল থেকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ফকীর বা অন্যান্য যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়েজ, সে সকল হকদারদের আপনি যাকাত প্রদান করবেন। স্বর্ণের নির্ধারিত নেছাব হচ্ছে, বিশ মিছক্কাল। রৌপ্যের নেছাব হচ্ছে, দুইশত দিরহাম অথবা এর সমমানের কাগজের টাকা, ব্যবসার মালপত্র। ব্যবসার বিভিন্ন মালপত্রের মূল্য যখন নেছাব পরিমান পৌছাবে তখন এক বছর অতিক্রম করলে এর মালিকের উপর যাকাত ওয়াজেব হবে।শস্য ও ফলের নেছাব তিনশত ছা'। যে জমি বিক্রয়ের জন্য তৈরী করা হয়েছে, তার মূল্যমানের যাকাত দিতে হবে। ভাড়ার জন্য তৈরী সম্পদের ভাড়ার উপরেই যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়িক মালের যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ২.৫ প্রতি বৎসর।

নদীর পানি,প্রবাহিত ঝর্ণার পানি বা বৃষ্টির পানির দ্বারা কষ্ট ব্যতীত কোন শস্যক্ষেত্র ফলের বাগানে পানি সরবরাহ সম্ভব হলে উৎপাদিত শস্য ও ফলের যাকাত হবে শতকরা দশভাগ। তবে কুপ থেকে বালতি দ্বারা

পানি সেচের মত কষ্টসাধ্য উপায়ে উৎপাদিত শস্য ও ফলের যাকাত দিতে হবে শতকরা ৫% । ফসল ও ফলের যাকাত প্রদানের সময় হচ্ছে তা সংগ্রহের সময়। যদি বৎসরে দুইবার অথবা তিনবার তা সংগ্রহ করা হয় তা হলে প্রতিবারই যাকাত প্রদান করতে হবে। উট, গরু ও ছাগলের যাকাতের পরিমান সম্পর্কে ইসলামী হুকুম- আহ্কামের কিতাব সমূহে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তা সেখান থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ البينة:

"তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তার এবাদত করতে, নামাজ কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।"

(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ:৫)

যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের আত্মপ্রশান্তি,তাদের প্রয়োজন মিটানো এবং তাদের ও ধনীদের মাঝে জোরদার সম্পর্ক সৃষ্টি করা। ইসলাম ধর্ম সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার বিষয়কে শুধুমাত্র যাকাত পর্যন্ত নির্ধারণ করেনি বরং আল্লাহ ধনীদের প্রতি দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রদের প্রতিপালনকে ওয়াজিব করেছেন।

মুসলমান পরিতৃপ্তি লাভ করবেন আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকবেন আল্লাহ এটাকে হারাম কেরছেন। ঈদুল ফিতরের দিন যাকতুল ফিতর (ফিতরা) প্রদানকে মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব করা হয়েছে। এটি হচ্ছে প্রতিজনের জন্য এমনকি শিশু ও চাকরের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে যা শহরে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের এক ছা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান। যদি কেহ কোন মুসলমান কিছু করার শপথ করেন তা না করে তাহলে আল্লাহ সেই মুসলমানের উপরে শপথ ভংগের কাফফারা[১] ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ নফল দান খয়রাতের প্রতি মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর রাস্তায় ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। তাদের ছাওয়াবকে বহুগুণে বেশী করার এমনকি প্রতিটি ছাওয়াবকে দশগুণ থেকে সাতশত গুণ বা অনেক বেশী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

---

(১) শপথ ভংগের কাফ্ফারা হচ্ছে একটি দাস মুক্ত করা অথবা ১০ জন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা কাপড় পড়ানো। এগুলো সম্ভব না হলে তিন দিন রোযা রাখতে হবে।

রোযা

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হচ্ছে, রমযান মাসের রোযা রাখা। রমযান মাস হিজরী সনের মাস সমূহের নবম মাস। রোযায় করণীয় হচ্ছে -

মুসলমান সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়ত করবেন, অতঃপর পানাহার ও সহবাস (যৌন মিলন) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবেন, এরপর ইফতার করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোটা রমযান মাসের দিনগুলোতে এইরূপ করতে থাকবেন। রোযার অগণিত উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে, এটি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশ পালন। বান্দাহ তার যৌন ইচ্ছা ও পানাহার আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে। এটি হচ্ছে আল্লাহর তাক্ওয়া অর্জনের বড় কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম। অপরদিকে রোযার স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকারিতাও রয়েছে অনেক। যা ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস সহকারে রোযা পালনকারীরাই উপলব্ধি করেন। আল্লাহ বলেন -

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ البقرة

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতই রোযা ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

আল্লাহর বাণীর শেষ অংশ হচ্ছে –

এটা ঐ রমযানের মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানব জাতীর জন্য হিদায়াত বা প্রকাশ্য সঠিক রাস্তা। হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। অতঃপর যেসব মাসে পারে সে যেন রোযা রাখে। কিন্তু যে রোগগ্রস্থ অথবা সফর অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনগুলিতে এটি পূর্ণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান কঠিন করতে চান না। যাতে তোমরা এর দিনগুলো পূর্ণ কর। এবং তোমাদেরকে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (বাকারা ১৮৩-১৮৫)

রোযার যে সমস্ত হুকুম আহকাম আল্লাহ কুরআনে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে নিশ্চয় রোগী ও মুসাফির যে কয়দিন রোযা ভেঙ্গেছেন রমযানের পরে ঐ কয়দিন রোযা আদায় করবেন। তেমনি হাইযগ্রস্থা ও নিফাস গ্রস্থাগণও। এদের জন্য রোযা রাখা ঠিক নহে। যে কয়দিন তারা রোযা ভেঙেছে পরে সেই কয়দিন রোযা রেখে নিবেন। ঠিক তেমনি যদি গর্ভবতীও দুগ্ধবতী মা তাদের জীবনও তাদের বাচ্চার জীবনের আশংকা করে, তাহলে রোযা কাজা (কাযা) করবেন। রোযাদার ভুল

করে খেলে ও পান করলে পরে স্মরণ হবে তাঁর রোযা শুদ্ধ হবে। কেননা, ভুল ভ্রান্তিও জোর-জবরদস্তির কারণে কিছু করলে উম্মতে মুহাম্মদী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য আল্লাহ মাফ করেছেন। তবে তার মুখের মধ্যে যা রয়েছে তা বাহির করে ফেলা ওয়াজিব।

হজ্জ

ইসলামের স্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে, জীবনে একবার বাইতিল্লাহিল হারামে (আল্লাহর পবিত্র ঘরে) হজ্জ আদায় করা। একাধিকবার হজ্জ আদায় নফল বলে গণ্য। হজ্জের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত ঃ এটি হচ্ছে একযোগে আত্মা, শরীর ও মালের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রতিটি জায়গাতে এক স্থানে মুসলমানদের সমবেত হয়ে, একই কাপড় পরিধান করে এ বিষয়ে একই রবের ইবাদাত করার সুযোগ লাভ করে। শাসক ও শাসিত, ধনী ও গরীব, সাদা ও কালো একই আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দা হওয়ার কারণে এক হয়ে হজ্জ পালনের মাধ্যমে পারস্পরিক জানাও সহযোগিতার পথ প্রসারিত হয়। এর মাধ্যমে তাদের সকলকে আল্লাহ পুরুত্থান করবেন। তারা তা স্মরণ করেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। (মুসলমানদের কিবলা) যেখানেই থাকুক না কেন, যার দিকে ফিরে আল্লাহর প্রতিটি নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন সেই কা'বার চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ এবং মক্কার অন্যান্য জায়গায় যেমন আরাফাত ও মুজদালিফায় এবং মিনায় নির্ধারিত সময়ে অবস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই সমস্ত পবিত্র

স্থানে আল্লাহ যে অবস্থায় নির্দেশ দিয়েছেন সেই অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করা। তবে স্বয়ং ক্বাবাহ এবং ঐ সমস্ত জায়গা ও যে কোন সৃষ্টকে কখনো ইবাদত করা যায় না, এরা কারো কোন ভাল মন্দ করতে পারে না, বরং একক আল্লাহরই জন্য ইবাদত নির্ধারিত। ভালমন্দ করার অধিকারী হচ্ছেন একক আল্লাহই। যদি আল্লাহ তার ঘরে হজ্জ করার নির্দেশ না দিতেন তাহলে সেখানে মুসলমানের হজ্জ করা ঠিক হত না। কেননা, ইবাদত কারো মতামত ও ইচ্ছার ভিত্তিতে হয় না, বরং এটি আল্লাহর কিতাবে তাঁর নির্দেশ অথবা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন –

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ آل عمران

" এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সমস্ত লোকদের উপর (ফরজ) যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ রাখে। আর যে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নহেন।" [১] (আল-ইমরান-৯৭)

(১) অপরদিকে ওলীদের কবর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানে মুর্খদের হজ্জ ওমরাহী, যা আল্লাহর নির্দেশ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশের পরিপন্থী। "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-(ছাওয়াবের নিয়তে) তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোথায় ভ্রমণের বাহন সাজাবে না; মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকছা।

হজ্জের সময় হোক বা অন্য সময় হোক উমরাহ প্রতি মুসলমানের উপরে জীবনে একবার ওয়াজিব। মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। যে করবে ছাওয়াব দেয়া হবে, আর যে করবে না তাকে সাজা দেওয়া হবে না। অপর পক্ষে, "যে হজ্জ করল অতঃপর আমার জিয়ারত করল না সে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করল" এই হাদীছ ছহীহ নয়। এর দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যা চাপানো হয়েছে।(১)

শরীয়াত যেসব স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে অনুমোদন করে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মসজিদে (নববী)। অতঃপর যখন যিয়ারতকারী মসজিদে পৌঁছে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করেন; তখন তার জন্য রাসূল (সাঃ) এর কবর যিয়ারত করা শরীয়ত অনুমোদন করেছে। সুতরাং তিনি যিয়ারতের সময় বলবেন–

السلام عليكم ورحمة الله

---

(১) এমনি হাদীছ "আমার মর্যাদাকে ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ কর কেননা আমার মর্যাদা আল্লাহর নিকট প্রশস্ত।" তেমনি হাদীস "যে পাথরের উপরে ভাল ধারণা রাখে সে তার উপকারে আসে।" এইরূপ সকল হাদীছই বানানো হাদীছ। যার কোন সত্যতা নেই। কোন গ্রহণযোগ্য হাদীছ গ্রন্থে এ গুলো পাওয়া যায় না। বরং এগুলো ও এর সমমানের হাদীছ সমূহ পথভ্রষ্ট এবং কোন কিছু উপলব্ধি ছাড়াই শিরক ও বিদায়াতের দিকে আহ্বানকারী আলিমগণের বইসমূহে পাওয়া যায়।

" হে আল্লাহর রাসূল আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।" এটি অত্যন্ত আদবের সাথে স্বর নিচু করে বলতে হবে। তাঁর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। বরং যেমন তিনি উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন ছাহাবাগণ (রাঃ) করেছেন, তেমনি ছালাম জানায়ে ফিরে আসতে হবে। অপর পক্ষে যারা নামাযে দাঁড়ানোর মত বিনয় অবনত চিত্তে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরে দাঁড়ায়, তার নিকটে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা করে, তার কাছে বিপদ মুক্তি চায়, আল্লাহর কাছে তাঁকে মাধ্যম বানায়; তারা আল্লাহর সাথে শিরককারী। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এদের সাথে সম্পর্কহীন। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা অন্য কারো সাথে এরূপ কিছু করা থেকে প্রতিটি মুসলমানের সাবধান থাকা উচিৎ। অতঃপর দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর কবর যিয়ারত করতেন। এরপর জান্নাতুলবাকী কবরবাসী, সকল শহীদ ও মুসলমান কবরবাসীদের কবর যিয়ারত করার শরীয়ত সম্মত নিয়ম অনুযায়ী যিয়ারত করবেন। আর তা হচ্ছে, যিয়ারতকারী মৃতের উপরে সালাম পাঠ করবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। মৃত্যুকে স্মরণ করবেন এবং এরপর প্রস্থান করবেন।

হজ্জ এবং ওমরাহ করণীয় বিষয়াদি ঃ

প্রথমত ঃ হাজ্জী সাহেব পবিত্র ও হালাল খরচাদি সংগ্রহ করবেন। মুসলমান সর্বদাই হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকবেন। কেননা হারাম খরচাদি হজ্জকে হজ্জ সম্পাদনকারীর দিকে ও দোয়াকে দোয়াকারীর দিকে ফিরিয়ে দেয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছে এসেছে, "যে গোশত হারাম খেয়ে উৎপন্ন হয়েছে তার জন্য দোযখই সবচেয়ে উত্তম স্থান।" হাজ্জী সাহেব ঈমানদার তাওহীদ পন্থী ও সৎ সংগীদের সাথী হবেন। গাড়ী বা অন্য কিছুতে তিনি মীকাতে পৌঁছলে সেখান হতে ইহরাম বাঁধবেন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচটি মীকাতে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছেঃ

(১) মদীনা বাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, (আবয়ারে আলী) (২) সিরিয়া, মিশর ও মরক্কোর অধিবাসীদের জন্য জাহফাহ (রাবেগের নিকটবর্তী), (৩) নাজদ এবং তায়ীফবাসী ও তাদের দিক থেকে আগতদের জন্য কারনুল মানাযিল (আস-সাইল অথবা মাহরাম উপত্যকা) (৪) ইরাকবাসীদের জন্য যাতুল ইরক। (৫) ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালমলম। যাদের জন্য এই সমস্ত স্থান নির্ধারিত, তারা ব্যতীত অন্যরাও যারা এই পথে আসবেন তাদের সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। মক্কার অধিবাসী ও মীকাতের মধ্যবর্তী স্থানের অবস্থানকারীদের কোন মীকাত নেই। নিজেদের ঘর হতেই তারা ইহরাম বাঁধবেন।

ইহ্‌রামের জন্য করণীয়

ইহ্‌রামের পূর্বে পরিস্কার হওয়া পবিত্র হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। অতঃপর মীকাতে যেয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। বিমানের যাত্রী নিজের দেশ হতেই প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন।

মীকাতের নিকটবর্তী হয়ে নিয়ত বেঁধে নিবেন ও তালবীয়াহ পাঠ করবেন। পুরুষের ইহরামের কাপড় হচ্ছে সিলাইবিহীন একটি চাদর ও একটি লুংগী। সমস্ত শরীর এ দু'টি দিয়ে ঢাকবেন তবে নিজের মাথা ঢাকবেন না। অপরদিকে মহিলাগণের জন্য নির্ধারিত কোন পোষাক নেই। তবে তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রশস্ত কাপড় যা দ্বারা আবৃত হওয়ার পর কেউ দেখলেও ফিতনা মুক্ত; তা পরিধান ওয়াজিব। ইহরামের সময় তাদরে চেহারা ও হাতদ্বয়ের উপরে সেলাইকৃত কিছু যেমন সেলাই করা মুখের পর্দা ও হাত মোজা পরিধান বৈধ নয়। যখন তারা কোন পুরুষদেরকে দেখবেন তারা মাথার উপরে রাখা উড়না দিয়ে উম্মাহাতুল মুমেনীন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহিলা ছাহাবীদের মত সমগ্র মুখমণ্ডল আবৃত করবেন। অতঃপর যখন হাজ্জী সাহেব ইরাম বাঁধবেন, মনে মনে ওমরার নিয়ত করবেন। এরপর এই বলে তালবীয়াহ পাঠ করবেন যে, اللهم لبيك عمرة

"হে আল্লাহ ওমরা অবস্থায় আমি আপনার সকাশে উপস্থিত।" এরপর হজ্জ পর্যন্ত (ইহ্‌রাম যা কিছু করা থেকে বিরত রেখেছিল উমরার পরে ইহ্‌রাম খুলে সে সব কিছু করে) আনন্দ উপভোগ করবেন। এই তামাত্তই (উপভোগ) উত্তম। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ছাহাবীদের (রাঃ) এইরূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য এটাকে অত্যাবশ্যক করেছিলেন। এবং যারা তাঁর এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পিছপাও হচ্ছিলেন, তাদের প্রতি তিনি রাগান্বিত হয়েছিলেন। তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু থাকবে তারা ক্বিরান অবস্থায় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মত অপেক্ষা করবেন। ক্বিরানকারী (ওমরা ও হজ্জ এক ইহ্‌রামে পালনকারী) তালবীয়াতে বলবেন-

اللهم لبيك عمرة وحجًا

"হে আল্লাহ আপনার কাছে উমরা ও হজ্জ অবস্থায় উপস্থিত হয়েছি।" কুরবাণীর দিন কুরবাণীর পশু জবেহ করা ব্যতীত তিনি তার ইহ্‌রাম পরিত্যাগ করবেন না। মুসলমান যখন ইহ্‌রামের নিয়ত বাঁধলেন তার প্রতি যা হারাম হয়ে গেল তা হচ্ছে -

১. সহবাস ও তার আনুসাঙ্গিক যেমন চুমু, যৌন উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ, যৌন কথাবার্তা, বিয়ের প্রস্তাব দান, বিয়ে পড়ানো। ইহ্‌রামকারী নিজে বিয়ে করতে পারবে না বিয়েও করাতে পারবে না।

২. চুল মুণ্ডন করা বা তা থেকে কিছু অংশ কাটা।

৩. নোখ কাটা।

৪. মাথায় লেগে থাকা এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা। তবে ছাতা তাবু ও গাড়ী দ্বারা ছায়া লাভ নিষিদ্ধ নহে।
৫. সুগন্ধি মাখা ও সুগন্ধের ঘ্রাণ নেওয়া।
৬. স্থলে শিকার করা সুতরাং তা নিজে শিকার করবেন না কাউকে শিকার দেখিয়ে দিবেন না।
৭. পুরুষেরা সেলাইকৃত পোষাক এবং মহিলারা মুখে ও হাত দ্বয়ে সেলাইকৃত কিছু পরিধান করবেন না। পুরুষরা স্যান্ডেল পরবেন। যদি তা সম্ভব না হয় মোজা পরতে পারেন।

যখন ইহ্‌রামকারী কা'বাতে পৌছাবেন 'হাজরে আছওয়াদ' থেকে শুরু করে তাওয়াফে কুদুমের সাত চক্রের মাধ্যমে তা প্রদক্ষিণ করবেন। এটা হচ্ছে তার উমরার তাওয়াফ। তাওয়াফের জন্য কোন দোয়া নির্দিষ্ট নেই।

আল্লাহর যিকির করবেন এবং যা আপনার জন্য সহজ হয় সেই দোয়া করবেন।[১] অতঃপর সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে অন্যথায় হারামের যে কোন স্থানগায় দুই রাকাআত তাওয়াফের নামায পড়বেন। এরপর সায়ীর জায়গার দিকে যাবেন এবং ছাফার

(১) তবে দুই রুকুর মাঝখানে হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তাই বলবেন। তা হচ্ছে

"হে আমার রব ! দুনিয়ায় আমাদের মঙ্গল ও আখিরাতে আমাদের মঙ্গল দান করুন। এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচান।"

থেকে (সায়ী) শুরু করবেন। সাফার উপরে উঠবেন, কেবলামুখী হবেন। তাকবীর বলবেন। আল্লাহর তাসবীহ পড়বেন। দোয়া করবেন। অতঃপর মারওয়ার দিকে সায়ী করবেন। এরপর মারওয়াতে আরোহন করবেন। কিবলামূখী হবেন। তাকবীর বলবেন। আল্লাহর যিকির করবেন। দোয়া করবেন। এরপর সাফার দিকে সায়ী করবেন। এভাবে যাওয়াকে একবার ও আসাকে আর একবার ধরে সাতবার সায়ী পূর্ণ করবেন। পরে মাথার চুল ছোট করবেন। মহিলারা চুলের পার্শ্ব হতে এক আংগুল পরিমাণ ছোট করবেন। এর মধ্যে দিয়ে তামাত্তু হাজ্জী সাহেবের ওমরাহ সম্পন্ন হল ও ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন। ইহরামের কারণে তারপরে যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেল। যদি মহিলা ইহরাম বাঁধার পূর্বে বা পরে হায়েজ গ্রস্থা হন বা বাচ্চা প্রসব করেন তাহলে তিনি ক্বারীন হাজ্জী বলে গণ্য হবেন এবং অন্যান্য হাজ্জীদের মত ইহরাম বাঁধার পরে ওমরাহ ও হজ্জের তালবীয়াহ পড়বেন। কেননা হায়েয ও নিফাছ ইহরাম বাধা বা মাশায়েরে (মিনা, আরাফাহতে) অবস্থানকে নিষিদ্ধ করে না। শুধুমাত্র তাওয়াফ করা হতে নিষিদ্ধ করে। সুতরাং তিনি তাওয়াফ ব্যতীত সমগ্র হাজীগণ যা করেন তাই করবেন। এবং তাওয়াফ করার জন্য তিনি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। যদি মানুষদের হজ্জের ইহরাম বাঁধা ও মিনার দিকে বাহির হয়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি পবিত্রতা অর্জন করেন,

তাহলে গোসল করবেন। তাওয়াফ করবেন, সায়ী করবেন, চুল ছোট করবেন এবং ওমরার ইহরাম হতে হালাল হবেন। পরে অষ্টম তারিখে যখন মানুষেরা হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তিনিও তাদের সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন। যদি তার পবিত্রতা অর্জনের পূর্বেই মানুষেরা হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন তাহলে তিনি ক্বারিন হাজী হিসাবে তাদের সাথে ইহরাম অবস্থায় তালবিয়াহ পড়বেন। এবং অন্যান্যদের মত মিনাতে যাওয়া, আরাফাতে ও মুযদালিফাতে অবস্থান পাথর নিক্ষেপ (রমী করা), কুরবানী দান, ঈদের দিনে চুল ছোট করা সব কিছুই করবেন। অতঃপর যখন তিনি পবিত্র হবেন, গোসল করবেন। হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। এই তাওয়াফ ও সায়ীই তার ওমরাহ ও হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে। যেমনটি হয়েছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) এর জন্য। নবী (আঃ) তাঁকে জানায়েছিলেন যে, যখন সে মানুষদের সাথে তাওয়াফে ইফাদাহ করেছে তখন পবিত্রতা অর্জনের পরে তার তাওয়াফ ও সায়ী হজ্জ ও ওমরাহর জন্য যথেষ্ট। কেননা কিরান হাজীর জন্য শুধুমাত্র এক তাওয়াফ এক সায়ী করতে হয়। যেমনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমোদন দিয়েছেন। এবং অন্য হাদীছে বর্ণিত তাঁর কাজ ও কথা এই কথারই সমর্থন দেয় তিনি বলেন- "কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে ওমরাহ প্রবেশ করেছে।" আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

যখন জুলহাজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ আসবে, হাজ্জী সাহেবান তাদের মক্কায় অবস্থানের স্থান হতে মীকাতে যেভাবে ইহরাম বেঁধেছিলে সেভাবে ইহরাম বাঁধবেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করবেন, এরপর ইহরামের কাপড় পরবেন এবং হাজী পুরুষ হউক বা মহিলা; হজ্জের নিয়ত করবেন। এবং এই বলে তালবীয়াহ পড়তে থাকবেন

"হে আল্লাহ আমি হজ্জের অবস্থায় আপনার সামনে উপস্থিত।" কুরবানীর দিন মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আকাবাতে পাথর নিক্ষেপের পরে পুরুষরা মাথা, মুখমণ্ডল ও মহিলাদের চুল না ছাটা পর্যন্ত পূর্বে বর্ণিত ইহরামের অবস্থায় অবৈধ সকল কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। যখন হাজ্জী সাহেব অষ্টম তারিখে ইহরাম বাধবেন তখন সকল হাজ্জী সাহেবদের সাথে মিনায় যাবেন। সেখানে রাত্রি যাপন করবেন এবং প্রতি ওয়াক্তের নামায নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত না করে কছরের সাথে আদায় করবেন। অতঃপর আরাফার দিন সূর্য উঠলে হাজ্জীদের সাথে নামিরাহ এর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। অতঃপর সেখানে ইমামের সাথে জোহর ও আসরের নামায একত্রে কসর করে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অতঃপর সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে আরাফার দিকে রওয়ানা হবেন। যদি কেউ সরাসরি মিনার থেকে আরাফাতে রওয়ানা দেন এবং সেখানে অবস্থান করেন, তা বৈধ হবে।

আরাফার সমস্ত জায়গায়ই অবস্থানের স্থান। আরাফাতে হাজ্জীগণ বেশী বেশী আল্লাহর যিকর দোয়া ও গোনাহ ক্ষমা চেতে থাকবেন। এ সময় কিবলাহ মুখী হবেন, পাহাড় মুখী নয়। কেননা পাহাড় আরাফাতের অংশ ব্যতীত কিছু নহে। ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেখানে আরোহনও ঠিক নহে। এর পাথর স্পর্শ করা (বরকতের জন্য) জায়িজ নহে। কেননা এটি হারাম বিদয়াত সূর্যাস্তের পুর্বে হাজ্জী সাহেব আরাফাহ পরিত্যাগ করবেন না। এবং সূর্যাস্তের পরে হাজী সাহেবগণ মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। যখন সেখানে পৌছে যাবেন মাগরিব ও ঈশার নামায একত্রে পড়বেন। ইশাকে কসর করবেন। সেখানে রাত্র অতিবাহিত করবেন। যখন প্রভাত হবে ফজরের নামায পড়বেন। আল্লাহর যিকর করবেন অতঃপর মিনার দিকে সূর্য উদয়ের পূর্বে রওয়ানা দিবেন, যখন মিনাতে পৌছবেন সূর্য উদয়ের পরে জামরাতুল আকাবাতে বুটের আকারের চেয়ে ছোট ও নয় বড় ও নয় এমনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। সেখানে স্যান্ডেল নিক্ষেপ জায়িজ নহে। কেননা এই খেলা করতে শয়তান উদ্বুদ্ধ করে। শয়তানের বিদ্রোহ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ) এর নির্দেশ ও তার রাস্তা অনুসরণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছঃ) যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। অতঃপর পাথর নিক্ষেপের পরে হাজ্জী সাহেব কুরবানীর পশু কুরবানী করবেন। অতঃপর পুরুষ চুল মুণ্ডন করবেন এবং

মহিলারা চুল ছাট করবেন। পুরুষরা যদি চুল ছাটেন জায়িজ হবে, তবে চুল মুণ্ডন করা তিনগুণ উত্তম। অতঃপর নিজস্ব কাপড় পরিধান করবেন। এবং এ সময় তার জন্য ইহরামের কারণে যা যা হারাম ছিল শুধুমাত্র স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবই হালাল হয়ে গেল। অতঃপর মক্কায় যেয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করবেন। এর মাধ্যমে সকল কিছু এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত তার জন্য হালাল হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মিনাতে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ঈদের দিনও পরের দুইদিন রাতসহ সেখানে রাত উদ্‌যাপন করা ওয়াজিব। এবং একাদশ ও দ্বাদশ দিনে তিনটি জামরাতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে পাথর নিক্ষেপ করবেন। ছোট জামরাহ, যেটি মিনার সাথেই অবস্থিত, সেখান থেকে পাথর নিক্ষেপ শুরু করবেন। অতঃপর মধ্যমটি এরপর ঈদের দিনে যেখানে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই জামরাতুল আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকটিতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন। নিক্ষেপের পাথরসমূহ মিনায় অবস্থানের জায়গা হতে সংগ্রহ করতে হবে। যদি কেহ দ্বাদশ দিনে পাথর নিক্ষেপ করে পরে মিনা পরিত্যাগ করতে চান ; করতে পারেন। যদি ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত কেউ অপেক্ষা করেন তাহলে তা উত্তম। এদিনেও সূর্য ঢলে যাওয়ার পরেই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। যদি তিনি সফরের ইচ্ছা করেন, কাবায় তাওয়াফে অদা'

করবেন। এর পর পরেই তাড়াতাড়ি সফর করবেন। হায়িয ও নিফাস গ্রস্থা মহিলা যদি হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী করে থাকেন তাহলে তার জন্য তাওয়াফ অদা' না করলেও চলবে। যদি হাজ্জী সাহেব তার কুরবানীর পশু একাদশ কিংবা দ্বাদশ কিম্বা এয়োদশ দিন পর্যন্ত যবেহ করতে অপেক্ষা করেন তা জায়িজ হবে। যদি কেহ হজ্জের তাওয়াফ ও সায়ী করতে সর্বশেষ মিনা ছেড়ে আসা পর্যন্ত ও দেরী করেন তা' তাঁর জন্য বৈধ হবে। তবে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে সেটাই উত্তম। আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জানেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে হে আল্লাহ দুরুদ সালাম বর্ষণ করুন।

বিশ্বাস (ঈমান)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিজের ও তার রাসূল (ছাঃ) এর ও ইসলামের স্তম্ভসমূহের উপরে ঈমান আনার পাশাপাশি তার ফিরিশতা[১] ও তার রাসূল (আঃ) গণের উপরে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের [২] উপরে

(১) ফিরিশতাঃ ঐ সমস্ত রূহ, যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। তারা অসংখ্য। আল্লাহ ব্যতীত তাদের কেউ গণনা করতে পারেনা। তাদের কেউ কেউ আসমানে অবস্থান করছেন কেউ কেউ আদম সন্তানদেরকে তত্ত্বাবধান করছেন।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূল (আঃ) গণের উপরে যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সত্য। তন্মধ্যে শুধু কুরআন ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। অপরদিকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের হাতে যা বিদ্যমান তা তাদেরই রচিত। তাদের উক্তি "ইলাহ তিনজন" ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র "এর প্রমাণ। কেননা নিশ্চয় ইলাহ এক, তিনি হলেন আল্লাহ। এবং ঈসা (আঃ) নিশ্চয় আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। যেমন কুরআনে এসেছে। সেখানে আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ হয়েছে যে, কুরআন সকল কিছুকেই রহিত করেছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা ওমর (রাঃ) এর হাতে তাওরাতের একটি পৃষ্ঠা দেখে রাগান্বিত হন এবং বলেন- হে খাত্তাব পুত্র, তুমি কি সন্দেহে রয়েছ ? আল্লাহর শপথ যদি আমার ভাই মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি আমার আনুগত্য করা ছাড়া অন্য কিছু করার চেষ্টা করতেন না। তখন ওমর (রাঃ) পৃষ্ঠাটি ছুড়ে ফেললেন ও বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

ঈমান আনা ওয়াজিব করেছেন,যে কিতাব সমূহের শেষ কিতাব ছিল কুরআন যা অন্যান্য সব কিছুকে রহিত করেছে ও অন্যের উপরে কর্তৃত্ব করার যোগ্য। আল্লাহর রাসূলগণের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ রাসূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সকলের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। কেননা তাদের রিসালাত হচ্ছে এক। তাদের দ্বীন হচ্ছে এক, আর তা হচ্ছে ইসলাম। তাদের প্রেরণকারীও এক তিনি হচ্ছেন বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। সুতরাং মুসলমানের ঈমান আনা উচিত যে, কুরআনে আল্লাহ যে সমস্ত রাসূল (আঃ)দের উল্লেখ করেছেন তাঁরা পুর্ববর্তী উম্মতের কাছে আল্লাহর পাঠানো রাসূল ছিলেন। এবং আরো ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর শেষ রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। বিশ্বের সমগ্র মানুষের নিকট পাঠানো হয়েছে। তাঁকে পাঠানোর পরে সকল মানুষই এমনকি ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও তাঁর উম্মত। কেননা মাটির উপরে সকল মানুষই মুহাম্মদ (ছঃ) এর উম্মত এবং তার অনুসরণ তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যারা মুহাম্মদ (ছাঃ) কে অনুসরণ করেনা ইসলামে প্রবেশ করে না, মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য রাসূল (আঃ)গণের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা মুসলমান মাত্রই সকল রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে বিশ্বাসী ও তাদের অনুসারী। যে মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে ঈমান আনে না, তাঁকে অনুসরণ করে না, দ্বীন ইসলামে

প্রবেশ করেনা, সে সকল রাসূল (আঃ) কে অস্বীকার করল। তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো যদিও সে একজনের উপর ঈমান আনার দাবীদার হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আল্লাহর কালাম থেকে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে।

রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাদীছে বলেন –

والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار .

"যার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ এই উম্মতের মধ্যে ইয়াহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক ; যে আমার সম্পর্কে শুনল অতঃপর আমি যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি তার উপরে ঈমান আনল না, সে দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য।" (মুসলিম শরীফ)

মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব কিতাব, প্রতিফল প্রাপ্তি ও বেহেশত দোযখের উপরে ঈমান আনা মুসলমানের প্রতি ওয়াজিব। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মুসলমান এই আকীদা বিশ্বাস পোষণ করবেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সকল কিছু জানেন। তিনি বান্দার কর্ম সম্পর্কে আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বেই জানেন।

এই জানা জিনিষকে তিনি তার নিকট লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। মুসলমান এটিও জানবেন যে আল্লাহ যা চান তাই হয়। যা চান না, হয় না।

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বান্দাহদেরকে তাঁরই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আনুগত্য কি ; তাদেরকে তাও বর্ণনা করেছেন। এই আনুগত্য করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন ও গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এবং গুনাহের কাজ কি তাও বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদেরকে এ সামর্থ্য ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন তারা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দিয়ে ছাওয়াবের অধিকারী হতে পারেন। ঠিক তেমনি আল্লাহর নিষেধকৃত কাজকে আঞ্জাম দিয়ে শাস্তির অধিকারীও হতে পারে। তবে বান্দার এই ইচ্ছা শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা শক্তিরই আওতাধীন। অপর দিকে যে সমস্ত কাজ করতে আল্লাহ বান্দাহদেরকে ইচ্ছা শক্তি ও ইখতিয়ার দেননি তার পরে অনিচ্ছা সত্বেও তাদের থেকে এ কাজ হয়ে থাকে। যেমন ভুল করে কিছু করা, কোন কিছু করতে ভুলে যাওয়া, কোন কিছু করতে বাধ্য করা, যেমন দারিদ্রতা,রোগ বালামুছিবত প্রভৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন না এবং সাজাও দিবেন না, বরং বালা-মুছিবত দারিদ্রতা ও রোগে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীরের উপর খুশী থেকে ধৈর্য্য ধারণ করলে বড় পুরস্কার দান করবেন।

এই পর্যন্ত যা বর্ণিত হল এর প্রতিটির উপরে ঈমান আনা প্রতিটি মুসলমানের ওয়াজিব। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে নিকটতম জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যদাবান হচ্ছেন

মুহছিনগণ।যারা আল্লাহরই ইবাদত করেন, তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তাঁর কাছে এমনভাবে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন, যেন তারা তাঁকে দেখছেন।
প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানী করেন না বিশ্বাস পোষণ করেন যে যেখানেই তারা থাকুক না কেন তিনি তাদেরকে দেখেন। তাদের কাজ কথাও নিয়ত থেকে কিছুই তার কাছে অপ্রকাশ্যে থাকে না। তারা তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করেন, তাঁর নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ করেন, যখন তাদের কেউ আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে পাপে লিপ্ত হয়, তা থেকে আল্লাহর কাছে তাড়াতাড়ি সত্য সঠিক তওবাহ করেন এবং কৃতগোনাহের কারনে লজ্জিত হন। আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চান ও ঐ কাজ পুনরাবৃত্তি করেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন –

ان الذين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

"যারা তাকওয়া অর্জন করেছে ও সৎকর্মশীল, (মুহসিন) আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।" (নাহল-১২৮)

ইসলামের জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন - اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا المائدة : ٣.

"আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম। আমি আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসাবে মনোনীত করলাম।" (মায়িদা-৩)

আল্লাহ তায়ালা বলেন - اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝

"নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় পথের দিকে এই কুরআন পথ নির্দেশ করে এবং যে সমস্ত মুমিনরা সৎ কাজ করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয় যে, নিশ্চয় তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।" (বনী ইসরাঈল-৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন - وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝ النحل

"এবং আমি তোমাদের উপরে ঐ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে সকল কিছুর পুংখানু পুংখানু বর্ণনা, হিদায়াত রহমত ও মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ নিহিত রয়েছে।" (নাহল-৮৯)

বিশুদ্ধ হাদীছে রয়েছে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন –

تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

"আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার দলিল ও প্রমাণাদির উপরে ছেড়ে দিলাম। যার রাত দিন সমান। তার থেকে যে ভিন্নমুখী হবে সেই ধ্বংস হবে।" রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন –

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وسنتي

"তোমাদের মধ্যে আমি যা রেখে গেলাম যদি তোমরা তাকে ধরে থাক কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।" (হাদীস)

পূর্বে বর্ণিত আয়াত সমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- নিশ্চয় তিনি মুসলমানদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন কমতি নেই। এবং এটিতে কখনো কোন কিছু বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। প্রতিটি সময়ে প্রতিটি জায়গায় ও প্রত্যেক উম্মতের জন্য এটি উপযোগী। তিনি বলেছেন যে, পরিপূর্ণ ক্ষমাসুন্দর এই মহান জীবন ব্যবস্থাকে মুসলমানদের জন্য প্রণয়ন করে ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিসালাতকে পাঠিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করে এবং তা অবলম্বীদেরকে তাদের শত্রুদের উপরে সাহায্য করে তিনি তার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করেছেন। আরো বলেছেন- তিনি ইসলামকে মানুষের জন্য জীবন

ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন। এ জীবন ব্যবস্থাকে তিনি কখনো অপছন্দ করেন না। এই জীবন ব্যবস্থা ব্যতীত কখনো কারো থেকে কিছুই তিনি গ্রহণ করবেন না। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, নিশ্চয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি এতে ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সত্যিকারের সকল সমাধান বর্ণিত হয়েছে। এর উপরে চলা ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। এটি বর্জনের মধ্যেই সকল অমঙ্গল নিহিত। প্রতিটি সমস্যা, চাই পুরাতন হোক, বর্তমান হোক অথবা ভবিষ্যতের হোক, এর ইনছাফ ভিত্তিক; সঠিক সমাধান কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।

যে সমাধান কুরআন পরিপন্থী তা মুর্খতা ও অত্যাচার। সুতরাং জ্ঞান, আকীদাহ, রাজনীতি, রাষ্ট্র, বিচার-পদ্ধতি, মানুষিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক জ্ঞান, শাস্তির পদ্ধতি প্রভৃতি যা কিছুরই মানুষ প্রয়োজন অনুভব করুক না কেন ; পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজে এবং তার রাসূল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভাষায় পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"কুরআন প্রতিটি জিনিষের পুংখানু পুংখানু বর্ণনা দিয়েছে।" পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে পরিষ্কার করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা, তার মজবুতি ও সর্বাঙ্গ সুন্দর-জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের জীবন পদ্ধতি

১. জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে ঃ মানুষের প্রথম ওয়াজিব সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, জ্ঞান অর্জন কর। যেমন আল্লাহ বলেন -

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

"অতঃপর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তোমার ও মুমিন পুরুষ এবং মুমিনাহ মহিলাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাও। আল্লাহ তোমাদের ঘোরা-ফেরার স্থান ও অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবে জানেন।" (মুহাম্মদ-১৯)

আল্লাহ বলেন -

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন।" (মুজাদিলা-১১)

আল্লাহ বলেন - وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ سورة طه

"তুমি বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দীন।" (ত্বহা-১১৪)
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

"অতঃপর তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" (নাহল-৪৩)
সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছহীহ হাদীছে বলেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।"
তিনি বলেন -

فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

"একজন মুর্খের উপরে জ্ঞানীর মর্যাদা তেমনি যেমন পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের উপরে।"
ইসলামে অত্যাবশ্যকীয়তার দিক থেকে জ্ঞানকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
প্রথম ভাগ ঃ প্রতিটি মুসলমান পুরুষ হোক মহিলা হোক এটি অর্জন করা ফরজ, কোন ওজর আপত্তি দেখায়ে এথেকে কেউ মূর্খ থাকতে পারেনা। এটি হচ্ছে দলীল ও প্রমাণ সহকারে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ জ্ঞান অর্জনের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ফরযে কিফায়াহ। এ বিষয়ে যখন যথেষ্ট সংখ্যক লোক জ্ঞান অর্জন করে তখন অন্যদের এ জ্ঞান অর্জন না করলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। এবং এটি বিশিষ্ট লোকদের জন্য ওয়াজিব না হয়ে, মুস্তাহাব বলে গণ্য হয়। এটি ইসলামী শরীয়াতের ঐ জ্ঞান বা মানুষকে বিচার করা ও ফতওয়া দেওয়ার যোগ্যতা দান করে। তেমনি শিল্প ও জীবন ধারনের জন্য মুসলমানেরা যে প্রয়োজন অনুভব করে, এমনি প্রয়োজনীয় পেশা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। সুতরাং জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানী যদি না পাওয়া যায় তাহলে মুসলামনদের শাসক এ ধরনের জ্ঞান অর্জনকে অত্যাবশ্যকীয় করে দিবেন।

২. আকীদা সম্শর্কে ঃ

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (দঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন ঘোষণা দিয়েছেন- সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা। তাঁরই ইবাদত করা সকলের উপরে ওয়াজিব এবং তাঁর এ ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারা যাতে যে কোন মাধ্যম বাদ দিয়েই সরাসরি আল্লাহর সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যার বর্ণনা "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ" এর অর্থে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবং নির্দেশ দিয়েছেন- একক আল্লাহর উপরে ভরসা করতে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা না করতে। কেননা তিনিই একমাত্র ভাল মন্দ করতে পারেন।

গলি নির্দেশ দিয়েছেন- তাকে ঐ গুণে পরিপূর্ণ গান্বিত করতে যে গুণে নিজেকে ও তাঁর রাসূল তাঁকে আল্লাহ) গুণান্বিত করেছেন। যেমন এর বর্ণনা পূর্বে দয়া হয়েছে।

১. মানুষের মাঝে সম্পর্ক গড়া সম্পর্কে ঃ-

আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানকে সৎ হওয়ার ও মানব জাতিকে কুফুরীর অন্ধকার হতে বাঁচায়ে ইসলামের জ্যোতির মধ্যে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য আমি আমার প্রতি অর্পিত ওয়াজিবের কিছু অংশ পালনের জন্য এই পুস্তক রচনা করেছি ও প্রকাশ করেছি। একজন মুসলমান অপরের সাথে যে সম্পর্ক গড়বে তা হবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সম্পর্ক এ নির্দেশ ও আল্লাহ্ দিয়েছেন, সুতরাং তিনি আল্লাহর সৎ বান্দাহ্ ও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (দঃ) এর অনুগত বান্দাদের ভালবাসবেন যদিও তারা অনেক দূরের হোক না কেন। এবং আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী ও আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অবমাননাকারীদের উপরে তিনি অসন্তুষ্ট থাকবেন, যদিও তারা নিকটের হোক না কেন। ঈমানের এ সম্পর্ক ঐ সম্পর্ক যা বংশ, দেশ ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পর্ক ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সকল বিচ্ছিন্নবাদী ও মতানৈক্য কারীদেরকে একত্রিত করেছে। কেননা ঐ সমস্ত সম্পর্ক অতি সত্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"তুমি এমন কোন কওমকে পাবে না যারা আল্লাহর উপরে ও শেষ দিনের উপরে ঈমান রেখে তাদের পিতৃপুরুষ অথবা সন্তান-সন্ততি অথবা ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা গোত্রগোষ্টিকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও ভালবাসে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়া অর্জন করেছে।" (হুজরাত-১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রথম আয়াতটিতে জানিয়েছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কখনো নিকটতম হলেও আল্লাহর শত্রুদের ভালবাসেন না। দ্বিতীয়টিতে বলেছেন- যে কোন রঙ ও যে কোন জাতিরই হোক না কেন আল্লাহ তায়ালার নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত ও সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেই, যে তাঁর অনুগত। আল্লাহ তায়ালা শত্রু ও বন্ধু সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং নিজের উপরে যেমন যুলুম হারাম করেছেন, তেমনি বান্দাদের মধ্যেও যুলুমকে হারাম করেছেন। আমানত রক্ষা করা ও সত্য বলার নির্দেশ দিয়েছেন। খিয়ানত করাকে হারাম করেছেন। মাতাপিতার প্রতি সদয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও দরিদ্রদের প্রতি অনুকম্পা

প্রদর্শন, কল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ , সকল কিছু এমনকি পশুর প্রতিও ভালব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদেরকে শাস্তি দিতে নিষেধ এবং এদের প্রতি করুণা করার হুকুম দিয়েছেন। (এমন কি হালাল পশু জবহ করার সময়ও যেমন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছুরিকে তীক্ষ্ম ও জবহকৃত পশুকে আরাম দানের নির্দেশ দিয়েছেন। জবহের জায়গা হচ্ছে গলা, শ্বাসনালী ও রক্ত প্রবাহের শিরা কেটে দিতে হবে। যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। উটের হাটুর নিচে সিনাতে আঘাত করে নহর করতে হয়। অপর দিকে বৈদ্যুতিক শট বা মাথায় মারা প্রভৃতি হারাম। এটা খাওয়া জায়িজ নয়।) তবে ক্ষতিকারক প্রাণী যেমন হিংস্র কুকুর, সাপ, বিচ্ছু, ইদুর, চিল, গিরগিটিকে এদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মারা যাবে, তবে শাস্তি দিয়ে নয়।

৪. মুমিনের জন্য আত্ম পর্যালোচনা ও উপদেশ গ্রহণঃ

মহা কুরআনের আয়াতে মানুষদেরকে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় যেখানে তারা থাকে না কেন আল্লাহ তাদেরকে দেখেন। তিনি তাদের সকল কর্ম সম্পর্কে জানেন। তাদের নিয়ত সম্পর্কে জানেন। তাদের কাজও কথা গননার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ফিরিশতারা তাদের সাথেই আছেন। তাদের থেকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যাই করা হয়, তারা তা লেখেন, তারা যা করছে ও বলছে, অল্প সময়ের মধ্যেই তার হিসাব কিতাব নেয়া

হবে। এই জীবনে তার নাফরমানী করলে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করলে, তাদেরকে কঠোর আযাবের হুশিয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহর উপরে ঈমান স্থাপনকারীদের জন্য এটাই বড় ধমক যা তাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। সুতরাং তারা আল্লাহকে ভয় করে, অপরাধ ও বিরোধিতা বর্জন করবেন। অপরদিকে সে আল্লাহকে ভয় করে না, ও সুযোগ পেলেই পাপে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাদের জন্য সাজার ব্যবস্থা করেছেন। যা তাদেরকে এই অপরাধ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ মুসলমানদের ভাল কাজের নির্দেশ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান কাউকে কোন পাপ কাজ করতে দেখলে শাক্তি দিয়ে প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখলে মুখ দিয়ে নিষেধ না করা পর্যন্ত, সে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। এবং আল্লাহ মুসলমানদের নেতাদের কে অপরাধীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা (হুদুদ) কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। হুদুদ হচ্ছে অপরাধের মান অনুযায়ী ঐ সমস্ত সাজা যা আল্লাহ তার কুরআনে ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাদীছে বর্ণনা করেছেন। সে গুলোকে অপরাধীদের উপরে কার্যকর অত্যাবশ্যক।

৫. সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে ঃ

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে আর্থিক ও মানবিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি যাকাত ও ছদকার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এবং যে কোন প্রকারের কষ্টই হোক না কেন এমনকি রাস্তা ও ছায়ায় পর্যন্তও কষ্টের কোন কিছু রাখা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর হারাম করেছেন। এবং যদিও এটা অন্যরা রেখে থাকে এর পরও এটাকে সরিয়ে ফেলার জন্য আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং নিরসনকারীর জন্য ছাওয়াব ও কষ্টদাতার জন্য শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে, নিজের ভাইয়ের জন্যও তাই ভাল মনে করবে এবং নিজের জন্য যা খারাপ মনে করবে, নিজের ভাইয়ের জন্যও তা খারাপ মনে করতে, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ المائدة : ٢

"এবং তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর, এবং পাপও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করবে না।" (মায়িদা-২)

আল্লাহ বলেন - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজ কর।" (হুজরাত-১০)

আল্লাহ বলেন -

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ النساء

"যারা দানখয়রাত অথবা সৎ কাজ অথবা মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তারা ব্যতিত তাদের অধিকাংশের পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এবং যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একাজ করে আমি তাদেরকে বড় পুরস্কার দান করব।" (নিসা-১১৪)

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন-

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"তোমাদের কেউ নিজের জন্য যা পছন্দ করো অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা পর্যন্ত মুমিন হবে না।" (মুসলিম শরীফ)

রাসূল (সাঃ) তাঁর শেষ জীবনে বিদায় হজ্জে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার পূর্বে তিনি যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আরো তাকীদ সহকারে বলেছেন-

"হে মানব জাতি তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক, হুশিয়ার, কোন অনারবের উপরে আরবীয়ের কোন আরবীয়ের উপরে কোন অনারবের, কোন লাল রঙের মানুষের উপরে কালো মানুষের, কোন কালো মানুষের উপরে লাল মানুষের তাকওয়ার মানদণ্ড ব্যতীত মর্যাদাতে কোন পার্থক্য নেই। আমি কি এখন পৌছে দিয়েছি। ? তারা বললেন- আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এটা পৌছে দিয়েছেন।"
তিনি আরো বলেন -

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم .

"নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্ভ্রম, তোমাদের এই দিন ও তোমাদের এই মাস ও তোমাদের এই শহরের মতই হারাম। (এদের এগুলোতে অন্যের হস্তক্ষেপ অবৈধ, সাবধান ! আমি কি একথা তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি ? তারা বলল- হ্যাঁ। এর পর তিনি আকাশের দিকে আংগুল উঁচু করে বললেন - হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।[১]

(১) এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার সংক্ষেপ বক্তৃতা, যা নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস গ্রন্থে ছড়ায়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর ভিতর থেকে যা পাওয়া গেছে আল্লামাহ শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন হামীদ তার গ্রন্থ "আল ইবাদাত শরহি খুতাবি হুজ্জাতিল আদা" তে একত্র করেছেন।

৬. স্বরাষ্ট্র বিষয়ক রাজনীতি সম্পর্কে ঃ

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে হতে একজন ইমাম নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার কাছে তারা নেতৃত্বের বায়য়াত গ্রহণ করবেন। এবং তাদেরকে এক হতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তারা হবে এক উম্মত। তাদের ইমাম ও আমীরদেরকে আল্লাহ অবাধ্য কোন কিছু করতে নির্দেশ দান ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে আনুগত্য দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর অবাধ্য কোন কিছুতে সৃষ্টির আনুগত্য করতে হবে না। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন -

"যদি মুসলমান তার নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেন, তার দিকে মানুষদের দাওয়াত না দিতে পারেন, তাহলে তাদেরকে আল্লাহ অন্য ইসলামী দেশে হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী দেশ হচ্ছে ঐটি, যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এবং মুসলমানদের ইমাম আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর ইসলাম ভৌগলিক সীমারেখা, জাতীয়তাবাদ, কাওমিয়াত ও সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করেনা। মুসলমানদের জাতীয়তা হচ্ছে ইসলাম। বান্দাহগণ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা। যমীন হচ্ছে আল্লাহ যমীন। মুসলমান সেখানে আল্লাহর শরীয়ত মান্য করবেন। এই শর্ত ছাড়া তিনি যে কোন স্থানে চলাফেরার

অধিকার রাখেন। তবে এর কোন একটির বিরোধিতা করলে আল্লাহর বিচার পদ্ধতি তার উপর কার্যকর হবে। আল্লাহর শরীয়ত পালন ও তার হুদুদ (নির্ধারিত সাজা) প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তা সম্ভ্রম ও সম্পদাদি সংরক্ষন করা ও প্রতিটি কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত। এ থেকে ভিন্নমুখী হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে সকল অমংগল।

আল্লাহ জ্ঞান বিলুপ্তকারী মাদকতা হারাম করে বিবেক বুদ্ধিকে সংরক্ষন করেছেন। এবং প্রত্যেক মাদক দ্রব্য পানকারীর জন্য প্রত্যেকবারে চল্লিশ থেকে আশি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছেন ; তাকে এথেকে বিরত রাখা, তার বিবেক বুদ্ধিকে হেফাজত করা ও তার অনিষ্টতা থেকে মানুষদেরকে রক্ষা করার জন্য।

কোন হত্যাকারী কাউকে অবৈধভাবে তার পরে চড়াও হয়ে হত্যা করলে তার উপরে কিছাছ (হত্যার পরবর্তে হত্যা) কার্যকরী করে মুসলমানের রক্তকে সংরক্ষন করা হয়েছে। যেমন অংগ প্রত্যংগের জন্য শরীয়ত ফিকাহ প্রণয়ন করেছেন, তেমনি মুসলমানদেরকে জান, মাল ও মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করার বিধান শরীয়ত প্রণয়ন করেছে। আল্লাহ বলেন -

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

"হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ! তোমাদের জন্য কিছাছের মধ্যে জীবন নিহিত রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়াহ অর্জন করতে পার।" (বাকারাহ-১৭৯)

রাসূল (সাঃ) বলেন -

" যে ব্যক্তি নিজের নফছকে রক্ষা করতে যেয়ে নিহত হল, সে শহীদ। যে তার পরিবার পরিজনকে রক্ষা যেয়ে নিহত হল, সে শহীদ। যে তার নিজের সম্পদকে রক্ষা করতে যেয়ে নিহত হল সে শহীদ।"
যে গীবত শরীয়ত অনুমোদন করেনি এমনি যে কোন গীবত মুসলমান অপছন্দ করে, তা করাকে শরীয়ত হারাম করেছে। শরীয়ত সম্মত প্রমাণাদি ব্যতীত সমকাম, যিনা প্রভৃতি চারিত্রিক অপরাধের থেকে মিথ্যা অপবাদকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করে মুসলমানদের মান সম্ভ্রমকে সংরক্ষণ করেছে।
যিনাকে উন্নত পর্যায়ের হারাম করে অবৈধ যৌন মেলা-মেশা থেকে বংশকে এবং চারিত্রিক অপরাধ দ্বারা দূষিত করা থেকে মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছে। যিনাকে বড় অপরাধ সমূহের মধ্যে অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছে। যিনাকারীর উপরে প্রবর্তিত শাস্তি কার্যকরী করার শর্ত পাওয়া গেলে তাকে কঠোর শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেছে। চুরি, ধোকা, লটারী, সুদ প্রভৃতি অবৈধ (হারাম) উপার্জনকে আল্লাহ হারাম করে সম্পদ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছেন। শর্ত পূর্ণ হলে চোর ও ডাকাতের হাত কাটার কঠোর শাস্তিকে তিনি শরীয়াতভুক্ত করেছেন। অথবা শর্ত পরিপূর্ণ না হলে চুরির প্রমাণ পাওয়া গেলে ঐ শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন,

যা তাকে একাজ থেকে বিরত রাখবে। এই সমস্ত শাস্তির বিধান (হুদুদ) প্রণয়নকারী হচ্ছেন- আল্লাহ। কোন কাজ তার সৃষ্টকে সংশোধনের উপযোগী, তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। তিনি তাদের প্রতি অতিব দয়ালু। অপরাধী মুসলমানদের গোনাহ ক্ষমার জন্য এবং অন্যান্যদের অনিষ্টতা থেকে -তাদের সমাজকে বাঁচয়ে রাখার জন্য এবং তাদের অন্যান্যদের অনিষ্টতা থেকে সমাজকে বাঁচায়ে রাখার জন্য এ সমস্ত শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছেন। ইসলামের শত্রুরা হত্যাকারীকে হত্যা করা ও চোরের হাত কাটাকে দোষারূপ করে। এরা রোগীর আক্রান্ত অংশ কাটাকে দোষারূপ করে ঐ সময় যখন তা না কেটে ফেললে গোটা সমাজ তার দ্বারা আক্রান্ত হবে।[১] পক্ষান্তরে তারা তাদের অত্যাচার করে অর্জিত সম্পদকে রক্ষার জন্য নির্দোষদের হত্যাকে ভাল মনে করে।

৭. পররাষ্ট্র বিষয়ক রাজনীতি সম্পর্কে ঃ

অমুসলিমদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ দান করে আল্লাহর ইমানের রোশনীতে আলোকিত করার জন্য ও পার্থিব জীবনে সম্পদের মধ্যে ডুবে থাকার অতৃপ্তি থেকে মুসলমান সত্যিকারের যে, আধ্যাত্মিক প্রশান্তিকর নিয়ামত ভোগ করেছেন তা থেকে বঞ্চিতদেরকে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহ মুসলমানগণ

(১) আক্রান্ত রোগীর ও তার পরিবারের অনুমোদন ক্রমে তার আক্রান্ত অংগ তার শরীরের নিরাপত্তার জন্যই কেটে ফেলা উত্তম।

ও তাদের নেতাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে সৎ হবে। তার সততা থেকে সকল মানব সন্তান লাভবান হবেন। এবং সে সকল মানুষদেরকে পরিত্রানের চেষ্টা করবে, অপর পক্ষে মানুষের তৈরী জীবন পদ্ধতি এথেকে ভিন্ন। কেননা এটি মানুষদের শুধু মাত্র সৎ নাগরিক হওয়ার দাবী জানায়, অন্য কিছুর নয়। এটি এই পদ্ধতির অসারতা ও অপরিপূর্ণতা এবং ইসলামের উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি অর্জনের জন্য আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে ইসলাম ও মুসলমানরা নিরাপত্তায় এবং আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রুরা ভীত থাকে। তেমনি ইসলামী শরীয়াতের আলোকে প্রয়োজন হলে অমুসলমানদের চুক্তিকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন। যতক্ষণ শত্রুরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ না করবে অথবা যতক্ষণ তারা এমন কিছু না করবে যা দ্বারা তারা যে চুক্তি ভংগ করেছে তা বোঝা যাবে; ততক্ষণ শত্রুদের সাথেও চুক্তি মুসলমানদের জন্য ভংগ করা আল্লাহ হারাম করেছেন। অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার প্রথমেই তাদেরকে প্রথমত ঃ ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দানের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন।

জানতে হবে, যদি তাও অস্বীকার করে তাহলে ফিতনা অপসারিত হয়ে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে হবে। যুদ্ধের সময়ে সরাসরি যুদ্ধের কাজ করে বা পরামর্শ দিয়ে স্বপক্ষের যুদ্ধাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছে এমন লোক ব্যতীত শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও উপসনালয়ের ধর্মযাজকদেরকে হত্যা করাকে আল্লাহ মুসলমানদের উপরে হারাম করেছেন। বন্দিদের সাথে উত্তম ব্যবহার করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এথেকে বোঝা যায়, কারো উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা অন্যের সম্পদ ভোগ করার জন্য ইসলাম যুদ্ধ করেনা। বরং এর দ্বারা সত্য ও সৃষ্টের ইবাদত থেকে ফিরায়ে স্রষ্টার ইবাদত মুখী করার জন্য ইসলাম যুদ্ধ করে।

৮. স্বাধীনতা ঃ

(ক) আকীদাহ বিশ্বাসের স্বাধীনতা ঃ

অমুসলমানগণ যারা ইসলামী হুকুমতের অধিনস্ত তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালা ইসলামেও তাদের জন্য আকীদাহগত স্বাধীনতা দান করেছেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এতে তাদের জন্য সুখ শান্তি ও মুক্তি রয়েছে। আর যদি তাদের দ্বীনের উপরে অবস্থান করে, তাহলে তারা নিজেরাই কুফরী, দুর্ভোগ ও দোযখের শাস্তিকে অনিবার্য করে। আল্লাহর নিকট তাদের যে, কোন ওজর থাকবেনা এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ। এবং

মুসলমানগণ তাদেরকে স্ব স্ব-আকীদাহ বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার স্বাধীনতা এই শর্ত সাপেক্ষে দিবেন যে, তারা নিজ হাতে মর্যাদাহীন অবস্থায় জিযিয়াহ প্রদান করবে। ইসলামের হুকুম আহকামের আনুগত্য করবে। মুসলমানদের সম্মুখে কুফুরী ধর্মীয় আচরণ প্রকাশ করবে না। অপরদিকে ইসলামে প্রবেশ করে মুসলমান হওয়ার পরে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা উপেক্ষা করা হবে না। যদি সে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় (মুরতাদ হয়) তার প্রতিদান হচ্ছে হত্যা। কেননা তাওবাহ করা ও ইসলামের দিকে ফিরে আসা ব্যতীত তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। সে সত্যকে জানার পর তাথেকে বিমুখ হয়ে গেছে। যদি ইসলাম বিনষ্টকারী কারণ সমূহের কোন একটিতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে সে মুরতাদ হয়ে থাকে (দ্বীন বিমুখ)। তাহলে সে এটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তাওবা করবে এর জন্য অনুতপ্ত হবে ও আল্লাহর কাছে গোনাহ ক্ষমা চাবে।

* ইসলাম বিনষ্টকারী কাজের সংখ্যা অনেক ঃ তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে -

১. আল্লাহর সাথে শিরক করাঃ- শিরক হচ্ছে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলাহ বানায়ে নেয়া। যদিও এই ইলাহ আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করা, তাকে আল্লাহর নিকটতম করার জন্য মাধ্যম হিসাবে হয়ে থাকুক না কেন। জাহেলী যুগের মুশরিকগণ যেমন সৎ ব্যক্তিদের সুপারিশ লাভের জন্য

তাদের প্রতিকী চিত্র তৈরী করে মূর্তিপূজা করত তেমনি ইবাদত ও ইলাহের নাম ও অর্থ বোঝে সে অনুযায়ী এগুলোকে ইলাহ স্বীকার করুক, অথবা উক্ত ইলাহ আল্লাহর সাথী ইলাহ, তার ইবাদত আল্লাহর ইবাদত তুল্য স্বীকার নাই করুক। যেমন ইসলামের দাবীদার মুশরিকগণকে যখন তাওহীদের দিকে আহবান করা হয়, তারা এইভেবে এটি গ্রহণ করে না যে, নিশ্চয় শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিকে সিজদাহ বান্দা অন্য কিছুকে "এই আমার ইলাহ" বলা। যারা মদকে অন্য নাম দিয়ে মদপান করে এরা তাদের মতই। তাদের অবস্থা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন –

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۝ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

"দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করে তাঁর ইবাদত কর। সাবধান বিশুদ্ধ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য। এবং যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারা বলে) যাতে তারা আমাদেরকে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, কেবল সে জন্যই তাদের ইবাদত

করি। যে বিষয়ে তারা মত পার্থক্য হয়েছে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মিথ্যুক কাফিরকে হিদায়াত দান করেন না।" (যুমার-২-৩)

আল্লাহ বলেন –

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ فاطر

"আমি আল্লাহ তোমাদের রব। তাঁর জন্যই সকল সম্রাজ্য। তাকে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা খেজুরের আঁটির উপরের আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদি শুনেও তোমাদের জন্য সেটার উত্তর দিতে পারবেনা। কিয়ামতের দিন তাদেরকে যে আল্লাহর সাথে তোমার শরীক করেছ, তারা তা অস্বীকার করবে। এবং তোমাকে সর্বজ্ঞাত আল্লাহর ন্যায় কেহ সংবাদ দিতে পারবে না।" (ফাতির-১৩-১৪)

২. মুশরিক ও তাদের মত ইয়াহুদী খৃষ্টান আল্লাহ-দ্রোহী অগ্নিপূজক প্রভৃতি কাফিরদেরকে এবং তাগুত যারা আল্লাহর অবতীর্ণকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা এমনকি আল্লাহর বিচার পদ্ধতির উপরে তারা সন্তুষ্ট নয় তাদেরকে কাফির না বলা

(ইসলাম বিনষ্টকারী)। অতঃপর তারা যে কাফের এটা জানার পরে যে তাদেরকে কাফির বলবে না, সেও কাফির হয়ে গেল।

৩. বড় শিরককে অনিবার্য করে এমন যাদুর কাজ। অতঃপর যাদুর কাজ করা এবং এ কাজের পরে সন্তুষ্ট থাকাকে কুফরী কাজ জেনেও, যে এ কাজ করবে ও এর পরে সন্তুষ্ট থাকবে কাফির হয়ে যাবে।

৪. ইসলামী শরীয়ত ও জীবন পদ্ধতির চেয়ে অন্য শরীয়ত ও জীবন পদ্ধতিকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা, অথবা নবী করিম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিচারের চেয়ে অন্যের বিচারকে উত্তম বলে বিশ্বাস করা। অথবা আল্লাহ কর্তৃক বিধান বিনে অন্যের বিধান বৈধ বলে বিশ্বাস করা।

৫. রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে এবং তার শরীয়াতের অন্তর্ভূক্ত এমন কিছুকে জানার পরেও এর উপরে সন্তুষ্ট না থাকা ও বিদ্বেষ পোষন করা।

৬. এমন কিছুকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, যা সম্পর্কে সে জানে যে এটি দ্বীনে ইসলামের অংশ বিশেষ।

৭. ইসলামের বিজয়ে অসন্তুষ্ট ও পরাজয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

৮. কাফিরদের বন্ধুরা কাফির এটা জেনেও সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

৯. যে কোন বিষয়েই হোক না কেন মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়ত থেকে বাহির হয়ে যাওয়া সে সঠিক

না, এটা জানার পরেও তার শরীয়ত থেকে বাহির হয়ে যাওয়াকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা।

১০. আল্লাহর দ্বীনকে বর্জন করা। অতঃপর যদি কেউ কিছু না জানে ও আমল না করে, তা স্মরণ করায়ে দেয়ার পরেও যে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়, সে কাফির হয়ে যাবে।

১১. ইজমা (উলামাদের একমত) অনুষ্ঠিত হয়েছে এমনি কোন আহকাম (বিধানাবলী) হতে কোন হুকুমকে জানার পরও তা অস্বীকার করা।

এ সমস্ত ইসলাম বিনষ্টকারী সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল প্রমাণাদি রয়েছে।

মতামতের স্বাধীনতা ঃ

(খ) আল্লাহ ইসলামে মতামতের স্বাধীনতা দিয়েছেন তবে শর্ত হচ্ছে, যেন এই মতামত ইসলামী শিক্ষা ধারা বিরোধি না হয়। কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে গ্রহণ না করে সকলের সম্মুখে সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এটাকে উত্তম জেহাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। মুসলমানদের শাসকগণকে উপদেশ দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি হচ্ছে মতামতকে সম্মান প্রদর্শনের উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামী শরীয়াতের পরিপন্থী মতামতকে প্রচারের অনুমতি ইসলাম দেয় নাই। কেননা সেটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা ফিতনা ফাসাদ ও সত্য বিরোধী।

(গ) ব্যক্তি স্বাধীনতাঃ- পবিত্র ইসলামী শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ ইসলামে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দান করেছেন। প্রতিটি মানুষ পুরুষ হোক বা মহিলা তাদের মধ্যে ও অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম যেমন বেচাকেনা, দান, ওয়াক্ফ, ক্ষমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এবং প্রতিটি পুরুষ মহিলাকে তাদের জোড়া বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং যা কেউ পছন্দ করে না, এ ক্ষেত্রে তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি। আকীদাগত পার্থক্য এমন পুরুষ নির্বাচনের অনুমতি ইসলাম কোন মহিলাকে দেয়নি। এটা উক্ত মহিলার আকীদা বিশ্বাস ও মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করার জন্যই। এ অনুমতি না দেয়ার কারণ হচ্ছে, তার ও তার পরিবারের ভালোর জন্য মহিলার অভিভাবক (বংশ) এর দিক থেকে নিকটতম পুরুষ অথবা এই পুরুষের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ওকীল) মহিলার বিয়ের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা ব্যভিচারীনীর কাজের সাথে মিল থাকার কারণে মহিলা নিজে নিজে বিয়ে সম্পাদন করতে পারেনা। বিবাহ হচ্ছে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কন্যার অভিভাবক বরকে বলবেন "জনৈকা হচ্ছে তোমার স্ত্রী।" বর বলবে "আমি গ্রহণ করলাম।"

ইসলাম কোন মুসলমানকে আল্লাহর শরীয়াতের সীমা লংঘনের অনুমতি দেয়নি। সে এবং তার অধীনস্থ সবই আল্লাহর যে শরীয়ত তার বান্দাদের জন্য রহমত

করে প্রণয়ন করেছেন, সে শরীয়াতের সীমার মধ্যেই তার চলাফেরা করা ওয়াজিব। এটি ঐ শরীয়াত, যার উপরে চললে সুখীসমৃদ্ধ জীবন লাভ হয়। এবং যে এর বিরোধীতা করে, দুঃখ লাভ করে ও ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ্ বিনা, সমকামকে শক্তভাবে হারাম করেছেন। আত্মহত্যাও আল্লাহ্ তার সৃষ্টিকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা পরিবর্তন করাকে মুসলমানের পরে হারাম করা হয়েছে। অপরদিকে গোঁফ খাঁটো করা, নখ কাটা, বগল সাফ করা, খৎনা দেয়া এগুলোও করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর শত্রুদের যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট রয়েছে এ সবের অনুরূপ হওয়াকে আল্লাহ্ মুসলমানের জন্য হারাম করেছেন। কেননা বাহ্যিক দিক থেকে তাদের মত হওয়া ও তাদেরকে ভালবাসা ধীরে ধীরে পূর্ণভাবে তাদের মত হতে ও প্রাণ দিয়ে তাদের ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ মুসলমানকে চান, যেন তিনি সঠিক ইসলামী চিন্তার উৎস হয়। যেন মানুষের উদ্ভাবিত চিন্তা-চেতনা ও তাদের মতামতের অনুসরণকারী না হয়। আল্লাহ্ চান মুসলমান যেন উত্তম আদর্শবান হয়। অন্ধ অনুকরণকারী না হয়। আর যদি অমুসলিমগণ যোগ্যতা, সঠিক কারিগরী ও কৌশলের অভিজ্ঞতার দিক থেকে মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম তাদের থেকে তা শিক্ষা করা ও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ হচ্ছেন মানুষের শিক্ষক।

আল্লাহ বলেছেন -

"আল্লাহ মানুষকে যা তারা জানে না তা শিক্ষা দিয়েছেন।" (আলাক-৫)

মানুষ নিজের স্বাধীনতা হতে লাভবান হওয়া তার মর্যাদা সংরক্ষণ করা ও মান-সম্ভ্রমকে নিজের আত্মার অনিষ্টতা বা অন্যের অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর জন্য এটি হচ্ছে মানুষের উপদেশ দান ও সংশোধনের উত্তম পন্থা।

(খ) বাসস্থানের স্বাধীনতা ঃ- আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বাসস্থানের স্বাধীনতা দিয়েছেন। অতঃপর কারো জন্য অন্য কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বৈধ নয়। এবং তার বাসস্থানে বিনা অনুমতিতে তার দিকে দৃষ্টিপাতও বৈধ নয়।

(ঙ) উপার্জনের স্বাধীনতা ঃ- শরীয়াতের সীমারেখার মধ্যে থেকে আল্লাহ মুসলমানকে উপার্জন ও ব্যয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ শ্রমদান ও উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তার নিজের ও তার পরিবারের ভরণ পোষণ সংকুলান হয়। এবং কল্যাণের ও ছাওয়াবের কাজে ব্যয় করতে পারে। একই সাথে সুদ, লটারী, ঘুষ, চুরী, ভবিষ্যৎ গুনা, যাদু, যিনা, সমকাম প্রভৃতির অবৈধ উপার্জনকে আল্লাহ হারাম করেছেন। তেমনি আল্লাহ প্রাণীর ফটো, মদ, শুকর, অবৈধ খেলা-ধূলার যন্ত্রপাতি, নাচ-গানের পারিশ্রমিক প্রভৃতি হারাম দ্রব্যাদির মূল্যকেও অবৈধ করেছেন।

এই সমস্ত উৎস থেকে যেমন উপার্জন হারাম তেমনি সেখানে ব্যয় করাও হারাম। সুতরাং শরীয়াত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত মুসলমান কোথাও ব্যয় করবেন না। এটি হচ্ছে আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য উপদেশ, হিদায়াত ও সংশোধনের উচ্চতর স্থান, যাতে করে তিনি হালাল আয়ের মাধ্যমে বিত্তশালী হয়ে সুখ সমৃদ্ধি জীবন যাপন করতে পারেন।

(চ) পরিবার সম্পর্কে ঃ ইসলামী শরীয়াতের আল্লাহ পরিবারের জন্য অত্যন্ত পরিপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন, যা সুখ সমৃদ্ধি লাভের উক্ত মাধ্যম, অতঃপর তিনি বিবাহের নিয়ম পদ্ধতির প্রণয়ন করেছেন। এবং তার নিজের কিতাবে এবং রাসূলের (ছাঃ) ভাষায় একে শরীয়াতের আওতাধীন করার বিজ্ঞান সম্মত কারণও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে চরিত্র ঠিক রাখা, গুপ্তাঙ্গকে অবৈধ কাজ (যিনা) থেকে রক্ষা করা, চোখকে হারাম দেখা থেকে রক্ষা করার মাধ্যম সমূহের মধ্যে বিবাহ অন্যতম মাধ্যম। বিবাহ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরস্পরে আরাম আয়েশ ও তৃপ্তিদানের ব্যবস্থা করে। কেননা আল্লাহ তাদের মধ্যে ভালবাসা দয়ার্দ্রতা তৈরী করেছেন। বিবাহের মাধ্যমে শরীয়াত সম্মতভাবে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যা মুসলমানদেরকে চরিত্রবান ও যোগ্যবান করে। বিবাহে স্বভাবগত দিক থেকে আল্লাহ যাকে যা করার যোগ্যতা দান করেছেন, সে অনুযায়ী স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সেবা করার সুযোগ দান করে। পুরুষ ঘরের বাহিরে

কাজ করে, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করার সম্পদ উপার্জন করে আর স্ত্রী বাড়ীর মধ্যে কাজ করে, গর্ভধারণ করে, শিশুদের দুগ্ধ দান করে, প্রতিপালন করে, স্বামীর জন্য খাদ্য ঘর বিছানা তৈরী করে। যদি পুরুষ ক্লান্ত ও চিন্তাযুক্ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে তার ক্লান্তি ও চিন্তা দূর হয়। স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির সংস্পর্শ লাভ করে এবং সকলেই আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ হয়ে দিন কাটায়। পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে স্ত্রী যদি নিজের খরচ করা বা নিজ আয় দিয়ে স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য কিছু কাজ করে তা নিষিদ্ধ নয়, তবে সেখানে কিছু শর্ত রয়েছে।

১. তার কাজ এমন হবে যেখানে পুরুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ নেই। যেমন তার ঘর, তার নিজের শষ্য ক্ষেত্র। নিজের স্বামীর, নিজের পরিবারের শস্য ক্ষেত্রে সে কাজ হতে হবে। অপর দিকে মিল-কারখানা, ব্যবসার স্থান, অফিস প্রভৃতি স্থানে পুরুষের সাথে মেলা-মেশা করে কাজ করা মহিলাদরে জন্য জায়িয নহে। এধরনের কাজ করার জন্য ছেলে তার স্বামী, পিতামাতা ও নিকটতমদের পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া ঠিক নহে। কেননা, এটি হচ্ছে তাকে ও সমাজকে ফাসাদের দিকে ঠেলে দেয়ার সমান। সুতরাং যে মহিলা নিজের বাড়ীতে পবিত্রাবস্থায় সংরক্ষিতা হয়, কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসে না, কোন পাপিষ্ট হস্ত তার দিকে প্রসারিত হয় না, কোন খেয়ানত কারীর চক্ষু তার দিকে তাকায় না।

অপরদিকে যখন সে পুরুষ সমীপে বাহির হয় তখন সে হারিয়ে যায় এবং সে নেকড়ের মাঝে অবস্থিত ছাগলের অবস্থায় উপনিত হয়। যেন কিছুক্ষণ বিলম্ব না করেই তাকে টুকরা টুকরা করা হবে। এ গুলো হচ্ছে তার মান মর্যাদার জন্য অতীব নিকৃষ্টতম অবস্থা। যদি কোন স্বামী এক স্ত্রীকে যথেষ্ট মনে না করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী অনুমোদন করেছেন, এই শর্ত সাপেক্ষে যে, বাসস্থান, খরচাদি, রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে সে ইনসাফ করবে। তবে হৃদয়ে ভালবাসার ক্ষেত্রে ইনসাফকে শর্ত করা হয়নি। কেননা এটা ঐ বিষয়ে, যা মানুষের সামর্থের উর্ধ্বে বলে আল্লাহ নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন তুমি গুরুত্ব দেওয়া সত্বেও কখনো স্ত্রীদের ভিতরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করতে পারার জন্য আল্লাহ একাধিক বিয়ে করাকে নিষেধ করেন নি। কেননা, এটা সামর্থের বাহিরের বিষয়। তার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও যারা সাধ্য অনুযায়ী ইনসাফ করতে পারবেন, তাদের একাধিক বিয়েকে শরীয়াতে অনুমোদন করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাদের জন্য কোন্‌টি মংগলের তা সবচেয়ে ভাল জানেন। এটা হচ্ছে পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই কল্যাণকর। কেননা একজন সুস্থ পুরুষের যৌন শক্তির দিক থেকে যে সামর্থ থাকে, তা দিয়ে সে চারজন মহিলার যৌণক্ষুধা নিবৃত্তি করে তাদেরকে চারিত্রিক কলুষমুক্ত করতে পারে। যদি তার জন্য একজন স্ত্রীকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়; যেমন

খৃষ্টান[১] ও অন্যান্যগণ করে থাকে। ইসলামের শত্রুরাও এদিকে আহবান জানাচ্ছে, যদি শুধু মাত্র একজন মহিলাকেই বিয়ে করা যাবে, এটা সীমাবদ্ধ করা হয়, তাহলে নিম্ন বর্ণিত অঘটন ঘটতে পারে ঃ-

প্রথমত ঃ যদি উক্ত ব্যক্তি মুমিন ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল হয়, আল্লাহকে ভয় করে তাহলে সে নফছের হালাল প্রয়োজনকে সংকোচিত করে বঞ্চিত জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হবে। কেননা একজন মহিলার গর্ভধারণের শেষ সময় গুলোতে, নিফাছ, হায়িয ও রোগের অবস্থায় যৌন কাজ সম্ভব হয় না। সুতরাং তার স্বামীকে জীবনের কিছু অংশ স্ত্রী ছাড়াই কাটাতে হয়। এটা ঐ সময়ের যখন উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আকর্ষণীয়া হয়ে ও একে অপরকে ভালবাসে আর যদি তার কাছে তার সে আকর্ষণীয়া না হয় তাহলে বিষয়টি হয় আরো ঝুকিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত ঃ যদি স্বামী আল্লাহর অবাধ্য হয়, খিয়ানতকারী হয়, সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে অশ্লীল যিনায় নিমগ্ন হবেই। অনেকেই যারা একাধিক বিয়েকে স্বীকার করেনা ঠিকই, কিন্তু অসংখ্য যিনা ও খিয়ানতের অপরাধে নিমজ্জিত হয়। এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, সে শরীয়াত সম্মত একাধিক বিবাহকে আল্লাহ মুবাহ করেছেন জানার পরও সে এর

(১) আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) একাধিক বিবাহ হারাম করেননি। এটা করেছে খৃষ্টানরা নিজেদের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে চারিতার্থ করার জন্য।

বিরোধীতা করে কুফরীর গণ্ডিতে প্রবেশ করবে।
তৃতীয়তঃ একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ হলে মহিলাগণ বিবাহ হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবে। এ অবস্থায় সতী চরিত্রবতী, দরিদ্র অবস্থায় বঞ্চিত জীবনযাপন করবে॥ আর অসতী পাপিষ্ঠাদের সম্ভ্রম নিয়ে পাপীরা আনন্দের খেলা খেলতে থাকবে, সবাই জানে যে, যুদ্ধও অন্যান্য বিপদজনক কাজ করতে যেয়ে পুরুষরা বেশী বেশী মৃত্যুর মুখামুখি হয়। সে জন্য মহিলার সংখ্যা পৃথিবীতে বেশী। ঠিক তেমনি মহিলারা সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মোহর সংগ্রহ ও দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনের অপরাগতার জন্য অনেক পুরুষ তা পেরে উঠে না। এ দ্বারা জানা গেল যে, নিশ্চয় ইসলাম মহিলাদের প্রতি ইনসাফ করেছে, অনুকাম্পা দেখিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শরীয়াত সম্মত একাধিক বিবাহে বিরোধিতা করে, তারা বস্তুতঃ মহিলাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা ও নবী (সাঃ)দের শত্রু। একাধিক বিবাহ নবী (আঃ)দের সুন্নাত। তারা মহিলাদের বিয়ে করতেন। তাদের প্রতি আল্লাহ যে শরীয়াত প্রবর্তন করে দিলেন, সে অনুযায়ী তাদেরকে একত্রিত করতেন।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রী যে হিংসা বা চিন্তা ভাবনায় পতিত হয়, বস্তুত এটি আবেগ জনিত কারণেই হয়ে থাকে। আর যাতে কোন বিষয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক নহে।

বিয়ের পূর্বে মহিলাদের পক্ষ থেকে তার বর্তমানের কোন স্ত্রী গ্রহণ না করার শর্তারোপ সম্ভব। স্বামী এটা গ্রহণ করলে সে শর্তপূর্ণ অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে যদি তার থাকা অবস্থায় অন্য বিয়ে প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। এবং তাকে যা দেয়া হয়েছে তা ফেরত নেয়া যাবে না।

বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সুখী না হওয়ার ক্ষেত্রে ও একের প্রতি অপরের ভালবাসা না থাকায় আল্লাহ তালাককে শরীয়াতে বৈধ করেছেন। এটা এই উদ্দেশ্যে যে, তাদেরকে যেন মতপার্থক্য অবস্থায় অসুখী জীবন কাটাতে না হয়। যাতে তারা একে অপরে মনের মত জায়গা বেছে নিতে পারে এবং উভয়ে ইসলামের উপরে মৃত্যুবরণ করলে দুনিয়াতে[১] ও আখিরাতে সুখ ভোগ করতে পারে।

১০. স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াত চিকিৎসার সকল মূল বিষয় আলোচনা করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ও রাসূল মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ সমূহে মানষিক ও শারীরিক রোগ সমূহের ও তার চিকিৎসার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

---

(১) মুসলমান সৎ মহিলারা পুনরুত্থান ও হিসাবের পরে বেহেশতে প্রবেশ করলে জান্নাতবাসী যাকে তিনি চান স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে। কোন মুসলিম স্ত্রীর কয়েকবার বিয়ে হয়ে মারা গেলে যিনি দুনিয়ায় তার সবচেয়ে প্রিয় স্বামী ছিলেন তিনি জান্নাতবাসী হলে, তাঁকেই তাঁকে দেয়া হবে।

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

"যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আমি কুরআনে তা নাযিল করি।" (বনী ইসরাইলঃ৮২)
রাসূল (ছাঃ) বলেছেন–

ما أنزل الله من داء إلا أنزل له عمله من علم وجهله من جهله

"আল্লাহ ঔষধ না দিয়ে কোন রোগ পাঠাননি। যাকে জানানো হয়েছে, জেনেছে যাকে এথেকে মূর্খ রাখা হয়েছে, মূর্খ রয়েছে।" তিনি বলেন –

تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام

"হে আল্লাহর বান্দারা ; চিকিৎসা কর, হারাম কিছু দিয়ে চিকিৎসা কর না।" (আল্লামাহ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রচিত "যাদুল মায়াদ ফি হাদিয়ী খাইরুল ইবাদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)
কেননা এটি ইসলামী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইসলামের বর্ণনা ও শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী বিষয়ক অত্যন্ত উপাকারী অত্যন্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থ।
১২. অর্থ, ব্যবসা, কারিগরি, কৃষি, পানি, খাদ্য, মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং যে সমস্ত সংস্থা মানুষদের শহর গ্রামকে হেফাজত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সেখানে চলা-ফেরার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার, জালিয়াতি ও মিথ্যা প্রতিরোধ করা প্রভৃতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে; এদের সম্পর্কে ইসলামে পরিস্কার ও পুরিপূর্ণভাবে বর্ণনা এসেছে।

১৩. গোপন শত্রু ও তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রসংগে ঃ

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুরআনে কারীমে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তাদের বহু শত্রু রয়েছে। যদি তাদের নেতৃত্ব মান ও তাদের অনুসরণ কর তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তাদের থেকে তিনি সাবধান করেছেন এবং তাদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তাও বর্ণনা করেছেন।

এই সকল শত্রুরা হচ্ছে ঃ

প্রথম শত্রু অভিশপ্ত শয়তান, যে অন্যান্য শত্রুদেরকে মানুষের বিরুদ্ধে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে আমাদের পিতা আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া (আঃ) এর ঐ শত্রু; যে তাদেরকে বেহেশত হতে বাহির করেছে। সে দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানদের জন্য চিরন্তন শত্রু। তারা যাতে কুফুরীতে নিমজ্জিত হয়ে, তার সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়- আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। সেই চেষ্টা সাধনাই সে করে। যাকে সে কুফুরিতে নিমজ্জিত করতে অক্ষম হয়, তাকে পাপে নিমজ্জিত করে ; যাতে সে আল্লাহর গজব ও শাস্তি লাভ করে। শয়তান রূহ বিশেষ, সে মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরা উপশিরাতে চলাচল করে। তাদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। খারাপকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে, যাতে সে তার আনুগত্য করে খারাপের মধ্যে পতিত হয়। এ থেকে বাঁচার

উপায় - যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন- যখন মুসলমান রাগান্বিত হয়ে পড়বেন এবং গুনাহে নিমজ্জিত হবে তখন বলবেন- "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم"

"বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

রাগান্বিত হয়ে তিনি কোন কিছু করবেন না, গুনাহের দিকে অগ্রসর হবেন না। তিনি মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করবেন যে, পাপের দিকে ঠেলে দেয়ার যে প্রবণতা মনে অনুধাবন করছে তা শয়তানের দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে। এর কারণ তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করা। অতঃপর শয়তানের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আল্লাহ বলেন -

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু এবং তাকে শত্রু বলেই মনে কর। সে তার দলকে আহবান জানায়, যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।"(ফাতির-৬)

দ্বিতীয় শত্রু ঃ আত্ম পূজা, এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে সত্যকে প্রত্যাখান করা ও অন্য কেউ সত্য নিয়ে আসলে তা গ্রহণ না করার মানুষিকতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ প্রত্যাহারের আকাঙ্খা জাগে। কেননা এগুলো সবই তার মন যা চায় তার উল্টা, আবেগকে সত্য ও ইনসাফের উপরে স্থান দেওয়া আত্ম পূজার অন্তর্ভূক্ত। এ শত্রু থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে,

বান্দাহ আল্লাহর নিকটে আত্মপূজা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। এবং যা আত্মপূজা করতে বাধ্য করে তা গ্রহণ করবে না আত্মার আনুগত্য করবে না বরং সত্য বলবে এবং টক হলেও তা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় শত্রু ঃ খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এমন ধরনের নফস। খারাপ কাজের নির্দেশের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মনের ও প্রাণের হারাম চাহিদা পূরণ যেমন - যিনা, মদ্যপান, রমজানে ওজর ছাড়া রোযা ভংগ প্রভৃতি যে গুলোকে আল্লাহ হারাম করেছেন সেগুলোর দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এ শত্রু থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকটে নিজের নফসের ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। হারাম চাহিদা পরিত্যাগের ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে এ গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। তেমনি যা খেলে ও পান করলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়, সে সমস্ত খাদ্য অথবা পানীয় আকর্ষণীয় হলেও বর্জন করে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। মনে মনে এ কথা স্মরণ করতে হবে যে, এর জন্য পরবর্তীতে লজ্জিত ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত পথ থাকবেনা।

চতুর্থ শত্রু ঃ মানুষ শয়তানগণ ঃ

এরা হচ্ছে আদম সন্তানদের মধ্যে পাপীগণ। যাদের নিয়ে শয়তান খেলা করে, তারা নিষিদ্ধ কাজ করতে থাকে এবং তাদের সাথী সংগীদেরকে এই কাজ সুন্দর করে প্রদর্শন করে। এ শত্রু থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে,

এথেকে সতর্ক থাকা, এথেকে দূরে অবস্থান করা ও এর সংস্পর্শে না বসা।

১৩. মহৎ উদ্দেশ্য ও সুখকর জীবন ঃ
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর বান্দাহ মুসলমানদের যে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ উপদেশ দিয়েছেন, তা এই পার্থিব জীবন নয় এবং এর নশ্বর আকর্ষণীয় কোন কিছুর নয়। বরং এটা হচ্ছে শাশ্বত সত্য ভবিষ্যতের প্রস্তুতি আর সেটাই মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবনের ওয়াসীলা মাত্র। এ জীবন পারলৌকিক জীবনের শষ্য ক্ষেত্র। এ জীবনই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তিনি সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণ করবেন-

"আমি জ্বিন ও মানুষদেরকে ইবাদাত করা ব্যতিত অন্য কিছু করতে সৃষ্টি করিনি।" (যারিয়াত ঃ৫৬)
আল্লাহর বাণী ঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ
نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨
وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩ لَا يَسۡتَوِيٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصۡحَٰبُ
ٱلۡجَنَّةِۚ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٢٠ الحشر
" হে যারা ঈমান এনেছ ! আল্লাহকে ভয় কর। প্রতিটি নফসের চিন্তা করা উচিৎ ; আগামী দিনের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যে

কাজই কর, তা আল্লাহ নিশ্চয় সবিশেষ খবর রাখেন। যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ; অতঃপর তারা নিজেদেরকে নিজেরা ভুলে গেছে, তোমরা তাদের মত হইও না। এরা হচ্ছে ফাসিক। দোযখবাসী ও বেহেশতবাসী সমান নয় বেহেশতবাসীগণ হচ্ছে সফলকাম।" (হাশর ঃ ১৮-২০) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا আল্লাহর বাণী –

يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

" অতঃপর যে এক অনুপরিমাণ পূণ্য কাজ করে সে তা দেখবে। এবং যে এক অনুপরিমাণ খারাপ কাজ কররেব সে তা দেখবে।" (যিলযালাহ ঃ ৭-৮)

সত্যিকারের মুসলমান আল্লাহর কালাম থেকে এই সকল আয়াতে ও এর সমঅর্থের গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সমূহ স্মরণ করবেন যে মহান উদ্দেশ্য ও যে কারণে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে ভবিষ্যত তাদের জন্য অবশ্য অবশ্যই অপেক্ষা করেছে সে সম্পর্কে তারা উপদেশ লাভ করতে পারেন। সুতরাং একক আল্লাহকে ইখলাসের সাথে ইবাদত করে এবং যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন সেই কাজের মাধ্যমে সত্যিকারের চিরস্থায়ী ঐ ভবিষ্যতের জন্য তার প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ। আল্লাহ তাহলে তার উপরে খুশী হবেন। তার আনুগত্যের কারণে এই দুনিয়াতে এবং মৃত্যুর পরে তার সম্মানিত আবাসস্থলে প্রবেশ করায়ে তাকে সম্মানিত করবেন। তাকে দুনিয়াতে সম্মানিত করা

হয়, তাঁকে সুন্দর জীবন দিয়ে বাঁচায়ে রাখা হয়। অতঃপর সে আল্লাহর বন্ধু হয়ে তারই তত্ত্বাবধানে বেঁচে থাকেন। তিনি আল্লাহর নূরই দেখেন .....। যে সমস্ত ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আদায় করেন ও এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গোপন কথা বলার সুযোগের স্বাদ তিনি অনুভব করতে থাকেন। নিজের ক্বলবও মুখ দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকেন। এ দ্বারা তার ক্বলব ও আরাম বোধ করে। তার কথাও কাজের জন্য সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে তার সুনামের স্বীকৃতি শুনতে পান, তারা তার জন্য দোয়া করেন যা তাকে আনন্দ দেয় ও তার বুককে প্রসারিত করে। তিনি তার প্রতি হিংসুক, তিরস্কারকারী তার সুখ্যাতির অস্বীকারকারীকে দেখেও তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানো বন্ধ করে দেন না, কেননা তিনি তো এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছওয়াব কামনা করেন। দ্বীনদার ও দ্বীনের প্রতি যারা রাগান্বিত এমনি দুষ্ট মানুষদেরকে তিনি কষ্ট দিতে ও ঠাট্টা করতে দেখেন ; যা তাকে আল্লাহর রাসুল (আঃ) গণের প্রতি যা হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়, সুতরাং এটাই আল্লাহর রাস্তার কর্মীদের একমাত্র পাওনা জেনে ইসলামের প্রতি তার গভীর ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং তার উপারে সে সুদৃঢ় হয়। তিনি নিজ হাতে অফিস অথবা কৃষিক্ষেত্র অথবা ব্যবসাকেন্দ্র অথবা কারখানায় কাজ করেন, এ জন্য যে, ইসলাম ও মুসলমানগণ তার উৎপাদন থেকে লাভবান হবেন। যেদিন তিনি এর

দ্বারা সেদিন আল্লাহর সাথে ইখ্‌লাস সহকারে সৎ নিয়ত নিয়ে মিলিত হবেন, তখন পূণ্য লাভ করবেনই, তা ছাড়াও এ দ্বারা দুনিয়াতে উত্তম উপার্জন সংগ্রহ করে তিনি নিজের নফস ও পরিবারের জন্য তা খরচ করেন, তা থেকে দানও করেন। অতঃপর তার আত্মা, ধনবান, ভদ্র, অল্পতুষ্ট হয়ে আল্লাহর নিকটে ছাওয়াব কামনার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। কেননা আল্লাহ সামর্থবান পেশাজীবি ঐ মুমিনকে পছন্দ করেন, যিনি খাবেন, পান করবেন, ঘুমাবেন তবে অপব্যয় করবেন না। এ জন্য যে, এগুলোর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য শক্তি অর্জন করে থাকেন, নিজ স্ত্রীকে ও নিজেকে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে পবিত্র রাখার জন্য মেলা-মেশা করেন এবং সন্তান জন্ম দেন। যারা আল্লাহর ইবাদত করবে ও তার জন্য জীবিত ও মৃত অবস্থায় দোয়া করবে। যা দ্বারা সৎ কাজ অবিরত হতে থাকবে। এ দ্বারা মুসলমানদের সংখ্যা বাড়বে। তিনি আল্লাহর কাছে সেজন্য ছাওয়াব লাভ করবেন।

তিনি আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল নিয়ামতের সাহায্য নিয়ে এবং এসব নিয়ামত যে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, তার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তার সকল নিয়ামতের শুক্‌র আদায় করবেন ও একাজ দ্বারা ছাওয়াব লাভ করবেন।

তিনি অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ কখনো কখনো ক্ষুধা, ভয়, রোগ, বিপদাপদ

অবতীর্ণ হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী জেনেও[১] তিনি দেখতে চান উক্ত বান্দাহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরের উপরে সন্তুষ্ট থেকে কতটুকু ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন। অতঃপর তিনি ছবর করবেন তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। প্রতিটি অবস্থায় ধৈর্য্যশীলদের জন্য যে ছাওয়াব অপেক্ষা করেছে তা লাভের জন্য সর্ব সময় আল্লাহর প্রশংসা করবেন, তাহলে তার কাছে বিপদ খুব হালকা হবে।

রোগী যেমনভাবে ঔষধের তিক্ততাকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে মেনে নেয়, তেমনি তিনিও বিপদাপদকে গ্রহণ করে নিবেন। যদি মুসলমান এই জীবনে যেমন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, এইরূপ উন্নত মানুষিকতা নিয়ে সত্যিকারে অবিনশ্বর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে, ঐ শাশ্বত কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারেন,

(১) আল্লাহ বান্দাদেরকে নির্দেশ দেন ও নিষেধ করেন, তিনি পূর্ব হতেই জানেন যে, কে তার আনুগত্য করবেন আর কে তার নাফরমানী করবে। এই জন্য যে, যাতে বান্দাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়। তাহলে পাপী বলতে পারবে না যে, আমার রবই আমার ঐ গুনাহের জন্য আমাকে সাজা দিয়েছে, যে গুনাহ আমি করিনি।
আল্লাহ বলেন -

তোমার রব তার বান্দাদের উপরে অত্যাচারী নন।"

দুনিয়ার কোন কিছু যেটাকে ঘোলাটে করতে ব্যর্থ, মৃত্যু ও যার প্রতিবন্ধক হয় না, তাহলে তার জন্য এই পার্থিব জীবনে ও মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবনে অনন্ত কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন –

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿القصص﴾

"ইহা পরকালের আবাসস্থল, এটি তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধ্যতা প্রকাশ ও ফাসাদ করেনা। আর উত্তম পরিনামই হচ্ছে মুমিনদের জন্য।"
(কাছাছ-৮৩)
মহান আল্লাহ কতই না সত্য বলেছেন –

"নর হোক অথবা নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে কেহ ভাল কাজ করবে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং অবশ্যই তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদেরকে পুরস্কৃত করব।" (নাহল-৯৭)
এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে এবং তার মত অন্যান্য আয়াত গুলোতে আল্লাহ বলেন যে, নিশ্চয় পুরুষ সৎ কর্মকারী ও মহিলা সৎকর্মকারিনী যারাই এই জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার আনুগত্য করবেন, আল্লাহ তাদেরকে তড়িৎ পুরস্কার দিবেন। আর তা হচ্ছে ঐ সুখী সমৃদ্ধ পবিত্র জীবন, যে বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করছি। তাছাড়াও বিলম্বে

মৃত্যুর পরেও যে পুরস্কার দিবেন, তা হচ্ছে শাশ্বত বেহেস্তের নিয়ামত। এ প্রসংগে রাসুল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

عجبا للمؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له
وإن أصابته خرا صبر فكان خيراً له .

"আশ্চর্য, মুমিনদের জন্য সব কাজই মংগলময়। তাকে যদি আনন্দের কিছু স্পর্শ করে তাহলে সে শুকর আদায় করে, সেটি তার জন্য ভাল, আর যদি দুঃখ জনক কিছু স্পর্শ করে এবং সে ধৈর্য্য ধরে তাও তার জন্য ভাল।"

এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একমাত্র ইসলামের মধ্যেই সঠিক চিন্তা ভাবনা, ভাল মন্দের সঠিক মাপকাটি, ইনসাফ ভিত্তিক পরিপুর্ণ জীবন ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। সুতরাং মনোবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা, রাষ্ট্র, অর্থ ও অন্যান্য নিয়মনীতি এবং মানুষের তৈরী পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেকটি মতামত ও চিন্তাচেতনা ইসলামের আলোকেই সংশোধন ও এ থেকেই সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। ইসলামের বিরোধিতা করে কৃতকার্য একেবারেই অসম্ভব, বরং যারা ঐ গুলোকে গ্রহণ করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ঐগুলোই হবে দুর্ভাগ্যের উৎসস্থল।

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয় ভ্রান্তির উন্মোচন

১. ইসলামের নিন্দুকগণ ঃ দুই ধরনের মানুষেরা বেশী বেশী ইসলামকে নিন্দা করে থাকে।

প্রথম শ্রেণী ঃ ইসলামের সাথে সম্পর্কের দাবীদার ব্যক্তিগণ। তারা মুসলমান হওয়ার দাবী করে, তবে কথা ও কাজে ইসলামের বিরোধিতা করে। তারা এমন কাজ আঞ্জাম দেয় ইসলামের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। তারা ইসলামের মুখপত্র নয়, এবং তাদের কাজকে ইসলামের কাজ বলা সঠিক নয়। তারা হচ্ছে-

(ক) আকীদাহ বিশ্বাস হতে বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। যেমন যারা কবরের পার্শ্বে তাওয়াফ করে। কবরবাসীর কাছে প্রয়োজন মিটানোর প্রার্থনা করে। কবরবাসীর থেকেই ভালমন্দ হওয়ার তারা বিশ্বাসী ইত্যাদি।

(খ) চরিত্র ও ধর্মের দিক থেকে দুর্বল ব্যক্তিগণ। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরদ্ব (ফরয) পরিত্যাগ করে। যিনা, মদ্যপান প্রভৃতি নিষিদ্ধ কাজে নিমগ্ন হয়। আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালবাসে। তাদের অনুকরণ করে।

(গ) মুসলমানদের মধ্যে তারাই ইসলামের নিন্দা করে, যাদের ঈমান দুর্বল। ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে তারা ব্যর্থ। কতিপয় ওয়াজিব কাজ পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করলেও, তা পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে না।

তারা এমন গোনাহে নিমজ্জিত হয়, যা বড় শিরক অথবা বিভিন্ন প্রকার কুফুরীর স্তরে পৌছায় না। তারা নিকৃষ্ট হারাম অভ্যাস লালন করে, যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক তো নেই-ই বরং সেগুলোকে ইসলাম বড় গোনাহ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যেমন- মিথ্যা, ধোকা দেয়া, প্রতিশ্রুতি ভংগ, হিংসা প্রভৃতি। এরা সকলেই ইসলামের অমংগল সাধন করে। কেননা অমুসলিম যারা ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ তারা ধারণা করে, ইসলাম তাদেরকে এগুলোর অনুমতি দিয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ ইসলামের শত্রুদের মধ্যে ইসলামের পরে যারা আক্রোশক তারা ও ইসলামকে নিন্দা করে। তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ (Orientalist), য়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ ও ইসলামের শত্রু। ইসলাম পরিপূর্ণ ও ক্ষমাসুন্দর জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে দ্রুত প্রসারিত হওয়া তাদেরকে গাত্রদাহ ছড়ায়ে দিয়েছে। কেননা ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম[১] , যা শুধুমাত্র সামনে

(১) শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- প্রতিটি নব যাতকই প্রকৃতির উপরে জন্ম নেয়। তাদের পিতামাতা তাদেরকে য়াহুদী অথবা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। এই বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, নিশ্চয় প্রতিটি মানুষ ইসলামী প্রকৃতির পরেই জন্ম নেয়। এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে এর পরেই সে বিশ্বাস স্থাপন করে। যদি তাকে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়, তাহলে সে পিছপা না হয়ে ইসলামকে গ্রহণ করবে। অপরদিকে য়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসনা প্রভৃতি ধর্ম ও বাতিল মতাদর্শকে যারা গ্রহণ করেছে, বস্তুত এটা প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণেই হয়েছে।

উপস্থাপনের সাথে সাথেই স্বভাবগত হওয়ার কারণে মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়। প্রতিটি অমুসলিমই অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে এবং যে দ্বীন বা মতবাদকে সে গ্রহণ করেছে তার উপরে অসন্তুষ্ট হয়েই দিন কাটাচ্ছে। কেননা আল্লাহ যে প্রাকৃতিক স্বভাব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন এটি তার পরিপন্থী। তবে সত্যিকারের মুসলমান এথেকে ভিন্ন। কেননা তিনিই একমাত্র তার দ্বীনকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছেন। এর কারণ হচ্ছে- ইসলাম সত্য ধর্ম, যা আল্লাহই প্রণয়ন করেছেন। আর আল্লাহ প্রণীত বিধানই মানুষকে আল্লাহ যে স্বভাবের উপরে সৃষ্টি করেছেন তার সংগে সংগতিপূর্ণ।

প্রাচ্যবিদ য়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে আক্রোশকগণ ইচ্ছা করেই ইসলাম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরে কখনো তাঁর রিসালাতকে মিথ্যা বলে, আবার কখনো তাঁর প্রতি দোষাবলী নিক্ষেপ করে, অহেতুক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত একজন পরিপূর্ণ মানুষ, সকল দোষ ও অপূর্ণতা মুক্ত। এছাড়াও সবজান্তা ও বৈজ্ঞানিক আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত হওয়ার পরেও ইসলামের ইনসাফপূর্ণ কিছু আহকামকে তারা বিকৃত করেছে, যাতে এথেকে

লোক ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন। কেননা তারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর সত্য সর্বোচ্চ, কোন কিছুই তাথেকে উচুঁ হতে পারে না। আল্লাহ বলেন –

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَٰفِرُونَ ۝ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ
عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۝ الصف

" তারা চায় নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে ফেলতে। আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন; চাই কাফিররা যতই অপছন্দ করুক না কেন। তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপরে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন। চাই মুশরিকগণ (এটাকে) যতই অপছন্দ করুক না কেন।" (ছফ ঃ ৮-৯)

ইসলামের উৎস সমূহ

হে জ্ঞানবান, যদি আপনি সত্যিকারের ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তাহলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, সুনানী আবি দাউদ, সুনানী নাসায়ী, সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে দারমী গ্রন্থে লিখিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্ভুল হাদীছ সমূহ পাঠ করুন। ইবনি হিশাম প্রণীত আস্-সীরাত আন্ নববীয়াহ, ইসমাইল বিন কাসীর প্রণীত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসীর, আল্লামাহ ইবনুল কাইয়িম প্রণীত 'যাদুল মায়াদ ফি হাদীয়ি খাইরিল ইবাদ ও এগুলোর মতই ইসলামের ইমান, তাওহীদ বরদার তীক্ষ্ণ বিবেক বুদ্ধি সহকারে আল্লাহর দিকে মানুষদের আহবানকারী তাদের গ্রন্থসমূহ ও পাঠ করবেন।

শাইখুল ইসলাম আহমদ বিন তাইমীয়াহ, আল ইমাম আল মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহ্হাব, যিনি বারশ হিজরী হতে এই পর্যন্ত শিরক প্রসার লাভের পর আরব দ্বীপে ও অন্যান্য কিছু জায়গায় তার ও তাওহীদ পন্থীদের আমীর মুহাম্মদ বিন সউদের বদৌলতে আল্লাহ দ্বীন ইসলাম ও তাওহীদের আকীদাহকে শক্তিশালী করেছেন।

অপরদিকে প্রাচ্যবিদ ও ঐ সমস্ত সম্প্রদায় যারা ইসলামের সাথে সম্বন্ধিত, পক্ষান্তরে তারা ইসলামের

পরিপন্থী, তাদের পুস্তকাদি ইসলাম বিরোধী বিষয়ের দিকেই আহবান করে। যার অধিকাংশই পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তাদের পুস্তকাদি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছাহাবী (রাঃ)দের সকলকে অথবা কিছু সংখ্যককে গালীগালাজ করে। অথবা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবানকারী ইমামগণ যেমন- ইবনি তায়মীয়াহ, ইবনি কাইয়িম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহ্হাব প্রমুখদের সমালোচনা করে। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উঠায়। বস্তুত এগুলো পথভ্রান্তকারী। সাবধান, এর ধোকায় পড়বেন না। এগুলো পাঠ করবেন না।

ইসলামী মাযহাবসমূহ

প্রত্যেক মুসলামনই এক মাযহাবের উপরে রয়েছে। তা হচ্ছে ইসলাম। যাদের উৎস স্থল হচেছ কুরআন ও রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস। অপরদিকে যাকে ইসলামী মাযহাব বলা হয়, যেমন চার মাযহাব হাম্বলী, মালিকী, শাফেয়ী, হানাফী। বস্তুত এগুলো দ্বারা ঐ সকল ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের স্কুল সমূহকে বুঝান হয়েছে যেখানে ঐ সকল বিদ্যানগণ তাদের ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। তাদের প্রত্যেকের ছাত্রগণ কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন করে যে নিয়মনীতি ও মাসয়ালা লিখেছেন, সে গুলোকে উক্ত আলেমদের নামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে এগুলোই তাদের মাযহাবের নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এগুলো ও ইসলামের মূল কাজ সমূহ একই। এগুলোর প্রত্যেকটির উৎস হচ্ছে, কুরআন ও রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসসমূহ। আমরা তাদের মধ্যে যে সমস্ত মত পার্থক্য দেখি, তা শাখা প্রশাখার ভিতরে, যা একেবারেই নগন্য। এ সকল আলেমগণই তাদের ছাত্রদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যা কুরআন ও হাদীছ সমর্থিত, তা যদি অন্যের কথাও হয় তা গ্রহণ করবে। মুসলমান এর যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। সে কুরআন ও হাদীছের দিকে ফিরে

যেতে বাধ্য। অপর দিকে অনেকেই এ সমস্ত মাযহাবের দিকে সম্বন্ধিত হয়েও আকীদাহ বিমুখ হয়, যেমন কবরে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে সাহায্য চায়, আল্লাহর বিশ্লেষণ সমূহকে সঠিক ও প্রকাশ্য অর্থ থেকে ফিরিয়ে এর অপব্যাখ্যা দেয় বাস্তবে তারা তাদের ঐ সকল মাযহাবের ইমামদের আকীদাহ বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা এ সকল ইমামদের আকীদাহ হচ্ছে, সালফী ছালিহীনের আকীদাহ, যার বর্ণনা মুক্তপ্রাপ্ত দলের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে।

ইসলাম বহির্ভূত দলসমূহ

ইসলামী বিশ্বে ইসলাম বহির্ভূত অনেক দলই পাওয়া যায় যারা ইসলামের দিকে সম্বন্ধীত। তাদেরকে মুসলামন বলে দাবী করা হয়। তারা সত্যিকারের মুসলমান নয়। কেননা তাদের আকীদাহ হচেছ আল্লাহ, তার নিদর্শনাবলী ও তার একত্ববাদের অস্বীকার করা। এই সমস্ত দলের মধ্যে একদল হচেছ 'বাতিনীয়াহ' সম্প্রদায় ; তাদের মতে সর্বস্থানে আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া , পূণর্জন্ম লাভ করা ও দ্বীনের প্রতিটি মূল বচন (আয়াত ও হাদীছের) অপ্রকাশ্য একটি অর্থ রয়েছে যা প্রকাশ্য যে অর্থ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন ও যার উপরে মুসলমানদের ঐক্য সংগঠিত হয়েছে তাথেকে ভিন্ন। তারা তাদের ইচ্ছামত এই সমস্ত অপ্রকাশ্য অর্থ তৈরী করেছে।[১]

(১) এই বাতিনীয়াহ সম্প্রদায়ের অনেক উপাধি রয়েছে, তারাও অনেক দলে বিভক্ত। ভারত, সিরিয়া, ইরান, ইরাক ও অন্যান্য দেশে তারা ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ববর্তী উলামাদের মধ্যে অনেকেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে শহরস্থানী তার বই "আলমিলাল অন নিহাল" যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। যেমন শেষ যুগীয় উলামাদের কেউ কেউ তাদের মধ্যে নূতন দলকেও উল্লেখ করেছেন যেমন কাদিয়ানীয়াহ, বাহায়ীয়াহ, তাদের মধ্যে হতে মুহাম্মদ সায়ীদ কিলানী "যাইলিল মিলাল অন নিহাল" মদীনা মুনাওয়ারাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাইখ আব্দুল কাদির, শাইখ আল হামদ "কিতাবুল আদিয়ান অল ফিরাক অল মাযাহির আল মুয়াছিরাহ" গ্রন্থে ঐ সমস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন।

এই 'বাতিনীয়াহ' সম্প্রদায়ের জন্মের উৎস হচ্ছে- ইয়াহুদী, অগ্নি উপাসক, আল্লাদ্রোহী দার্শনিকগণ যখন পারস্য দেশে ইসলামের প্রসারে ভীত হয়ে পড়ল, তখন একত্রিত হয়ে এমন একটি মতাদর্শ আবিস্কার করার জন্য পারস্পরিক পরামর্শ করল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করা এবং মহাগ্রন্থ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে চিন্তায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। যাতে মুসলমানগণ বিভিন্ন দলে পৃথক হয়। এজন্য তার এ বিধ্বংসী মতাদর্শের উদ্ভাবন করে এবং এর দিকে অন্যদেরকে আহবান জানায়।

তারা নিজেদেরকে আলি বাইতের দিকে সম্বোধন করে। সাধারণ জনগণকে ভালভাবে ধোকা দেয়ার জন্য তারা আলি বাইতের দলভুক্ত বলে দাবী করে। এ দ্বারা তারা অনেক মূর্খ মানুষদেরকে শিকার করেছে ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে।

ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে 'কাদিয়ানীয়াহ' অন্যতম। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাম অনুযায়ী এরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সে নবী হওয়ার দাবী করে। ভারতে ও তার আশে-পাশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে তার প্রতি ঈমান আনার আহবান জানায়। ইংরেজগণ ভারতে তাদের উপনিবেশ শাসনের সময় তার ও তার অনুসারীদেরকে ব্যবহার করে। তাকে ও তার অনুসারীদেরকে প্রচুর সুযোগ দিত যাতে করে অনেক মূর্খরা ও তার অনুসারীতে রূপান্তরিত হয়। কাদিয়ানীরা ইসলামকে মুখে প্রকাশ করলেও আসলে

তারা ইসলামকে ধ্বংস করা অন্যদেরকেও এর গণ্ডি হতে যথা সম্ভব বের করে নিতে চেষ্টা করে। প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, সে (বারাহীনে আহমদীয়াহ) বই লিখেছে, সেখানে সে নবুয়তের দাবী করেছে, ইসলামের মূলবচন (নুছুছ) সমূহকে রদবদল করেছে। তন্মধ্যে তার দাবী, ইসলামে জিহাদ রহিত হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ওয়াজিব তারা যেন ইংরেজের সাথে সন্ধি স্থাপন করে। ঐ সময় সে অন্য একটি বইও লেখে, যার নাম (তিরিয়াকুল কুলুব)। এই মিথ্যুক বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ১৯০৮ সালে মারা যায়। তার এই দাওয়াত ও এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব একজন পথভ্রষ্ট লোক- আল হাকীম নুরুদ্দীনের কাছে ছেড়ে যায়।

ইসলাম বহির্ভূত এমনি বাতিয়ানীয়াহ সম্প্রদায়ের অন্যতম সম্প্রদায় হচ্ছে, বাহায়ীয়াহ সম্প্রদায়। আলী মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি ১৯তম খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইরানে এটাকে প্রতিষ্ঠা করে। কারো মতে তার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ আলী সিরাজী। সে ছিল শিয়াদের 'ইছনা আশারীয়াহ' সম্প্রদায়ের। এর পরে সে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নিজে বাহায়ীয়াহ সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে আবিস্কার করে। এবং নিজেকে আপেক্ষিত মাহাদী বলে প্রথমে ও পরে তার মধ্যে আল্লাহ অবতীর্ণ হয়েছেন বলে দাবী করে, এবং মানুষের ইলাহ হয়ে বসে। বাস্তবে কাফির ও আল্লাহদ্রোহীগণ আল্লাহ সম্পর্কে যা বলে তিনি তাথেকে বহু উর্ধ্বে। সে

পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব, বেহেশত, দোযখকে অস্বীকার করে। সে কাফির ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের পথে চলতে থাকে। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে তাদেরকে এক করে ফেলে। সে শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুওয়াতকে ও ইসলামের বহু হুকুম আহকামকে অস্বীকার করে। তার ধ্বংসের পরে তার মন্ত্রী যে 'বাহা' নামে খ্যাত হয়, তার দাওয়াতের প্রসার ঘটায় এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তার দিকেই সম্বন্ধ করে এই সম্প্রদায়ের নাম দেয়া হয়েছে- বাহায়ীয়াহ।

মুসলমান হওয়ার দাবী করা, নামায আদায় করা, রোযা রাখা, হজ্জ করা সত্ত্বেও শিয়াহদের বিরাট অংশ ইসলাম বহির্ভূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তারা দাবী করে যে, জিব্রাইল (আঃ) রিসালাতকে মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দিয়ে খিয়ানত করেছেন, বাস্তবে এটা আলী (রাঃ) এর নিকটেই পাঠান হয়েছিল। তারা বলে মুসলমানদের হাতে বর্তমানে অবস্থিত কুরআনে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন রয়েছে। এবং তারা নিজেদের জন্য বিশেষ কুরআন তৈরী করে নিয়েছে। তাতে নিজের পক্ষ হতে আয়াত ও সূরা সন্নিবেশ করেছে। তারা নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে সবচেয়ে উত্তম মুসলমান আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উম্মুল মো'মেনীন আয়িশা (রাঃ) কে গালী দেয়। আলী (রাঃ) ও তার সন্তান সন্ততিদের কাছে সুসময় ও দুঃসময় প্রার্থনা জানায়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছে

দোয়া করে। নিজেদেরকে শিয়া নামকরণ করে। অর্থাৎ আহলি বাইতের দল। পক্ষান্তরে আলী (রাঃ) ও তার সন্তান সন্ততিদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা শিয়ারা তাদেরকে আল্লাহর সাথে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর পরে মিথ্যা চাপায়েছে। তার বাণী রদবদল করেছে। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করছেন।

বাতিনীয়াহ ঐ কাফির ও প্রত্যাখ্যাত সম্প্রদায় যার উল্লেখ আমরা করেছি। এরা কাফির সম্প্রদায়, যারা ইসলামী দল বলে দাবী করে, বাস্তবে তারা ইসলামকে ধ্বংস করছে। সুতরাং প্রতিটি জায়গার হে জ্ঞানী, হে মুসলিম আপনার সাবধান হওয়া উচিৎ এই মর্মে যে, ইসলাম শুধু দাবী করলেই হয় না। বরং কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) এর প্রমাণিত হাদীছসমূহকে জানা ও সে অনুযায়ী আমলকে ইসলাম বলে। অতঃপর মহাগ্রন্থ কুরআন ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ নিয়ে গবেষণা করুন ; হিদায়াত, নুর ও সোজা রাস্তা পাবেন যা আপনাকে বিশ্বের রব আল্লাহর নিকটে নিয়ামতের জান্নাতে যেয়ে সৌভাগ্য লাভের পথে পৌঁছে দিবে।

মুক্তির দিকে আহবান

হে জ্ঞানবান, চাই পুরুষ হও বা মহিলা, যে এখনো পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করনি তোমার কাছে মুক্তি ও সুখ সমৃদ্ধির এই আহবান পৌছাচ্ছি এই বলে যে, মৃত্যুর পরে কবরে ও পরে দোযখের আগুনে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাও। আল্লাহকে রব, মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করে নিজেকে রক্ষা কর। সত্যের সাথে বল যে, আল্লাহ ব্যতিত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল। পাঁচবার নামায পড়। তোমার সম্পদের যাকাত দাও। রামাদান মাসের রোযা রাখ। আল্লাহর ঘর হারাম শরীফে যদি তার রাস্তা অতিক্রমে সামর্থ হও হজ্জ কর। আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমরা ইসলামের ঘোষণা দাও। কেননা এছাড়া কোন শান্তি বা মুক্তি নাই। মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া সত্যিকারের ইলাহ নেই তার শপথ করে বলছি- নিশ্চয় এই ইসলাম হচ্ছে ঐ সত্য দ্বীন যা ব্যতীত আল্লাহ কারো পক্ষ থেকে কোন দ্বীনকে গ্রহণ করবেন না। এবং আমি আল্লাহ , ফিরিশতা ও সকল সৃষ্টিকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই,মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, ইসলাম সত্য দ্বীন এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালার করুণা ও অনুকম্পার মাধ্যমে আমি , আমার সন্তান সন্ততি ও

মুসলমান ভাইয়েরা যাতে সত্যিকার মুসলমান হন, এই দোয়াই করছি। তিনি যেন আমাদের উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করে বেহেশতে আমাদের সত্যবাদী আমানতদার নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্য সকল নবী (আঃ) এর পরিবার পরিজন, সাথী-সংগীদের সাথে একত্রিত করেন; তাই কামনা করছি। আল্লাহর কাছে আরো চাচ্ছি যে, যারা এই পুস্তক পাঠ করবেন ও শুনবেন তাদেরকে এথেকে লাভবান করুন। হুশিয়ার! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি ? হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষ্য থাকুন। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জানেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার ও সাথী-সংগীর উপর দরূদ ও সালাম। সমগ্র বিশ্বের রব আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

সমাপ্ত

الديـــن الحـــق

تأليف

فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر

ترجمهُ للبنغالية

أ. ص. م طريق الإسلام

حقوق الطبع ميسرة لكل مسلم يريد توزيعه لوجه الله

أما من أراد بيعه فعليه الاتصال بالمكتب هاتف ٤٣٣٠٨٨٨ (أربعة خطوط)

هذه الطبعة

تمت بإشراف المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد

بالبديعة والصناعية الجديدة

عناوين المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد

شعبة الجاليات
(وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)
تليفون ٠١/٤٠١٠٩٠٤ الرياض ١١١٣١

المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد بالبديعة والصناعية الجديدة
تليفون ٠١/٤٣٣٠٨٨٨ - ٠١/٤٣٠٣٥٧٢
فاكس: ٠١/٤٣٠١١٢٢ ص. ب ٢٤٩٣٢ الرياض ١١٤٥٦

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء
تليفون ٤٠٣١٥٨٧ / ٠١/٤٠٣٠١٤٢
فاكس ٤٠٥٩٣٨٧ ص. ب ٢٠٨٢٤ الرياض ١١٤٦٥

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأم الحمام
تليفون ٠١/٤٨٢٦٤٦٦ فاكس ٠١/٤٨٢٧٤٨٩
ص. ب ٣١٠٢١ الرياض ١١٤٩٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانه
تليفون ٠١/٤٢٤٠٠٧٧ فاكس ٤٢٥١٠٠٥
ص. ب ٩٣٦٧٥ الرياض ١١٦٦٣

مركز الدعوة والإرشاد بالدرعية
تليفون ٠١/٤٨٦٠٦٠٦ فاكس ٤٨٦٠٢٨٤
ص. ب ٧٠٠٣٢ الرياض ١١٥٦٧

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة
تليفون ٤٩١٨٠٥١ / ٠١ فاكس ٤٩٧٠٥٦١
ص. ب ٨٧٢٩٩ الرياض ١١٦٤٢

شعبة توعية الجاليات بالخرج
تليفون ٠١/٥٤٨١٣١١ فاكس ٥٤٤٠٦٦٢
ص. ب ٩ الخرج ١١٩٤٢

شعبة الجاليات بالدمام
تليفون ٨٢٧٢٧٧٢ / ٨٢٦٣٥٣٥ / ٠٣
فاكس ٨٢٧٤٧٠٠ الدمام ٣١١٣١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء
تليفون ٥٨٦٦٦٧٢ / ٠٣ فاكس ٥٨٧٤٦٦٤
ص. ب ٢٠٢٢ الأحساء ٣١٩٨٢

مركز الدعوة والإرشاد بالزلفي
تليفون ٠٦/٤٢٢٥٦٥٧ فاكس ٤٢٢٤٢٣٤
ص. ب ١٨٢ الزلفي ١١٩٣٢

مكتب توعية الجاليات بعنيزة
تليفون ٠٦/٣٦٤٤٥٠٦ ص. ب ٨٠٨

مركز الدعوة والإرشاد ببريدة
تليفون ٣٢٤٨٩٨٠ / ٠٦
فاكس ٣٢٤٥٤١٤ ص. ب ١٤٢

مركز توعية الجاليات بحائل
تليفون ٠٦/٥٣٢٤٧٤٨ فاكس ٥٤٣٢٢١١ ص. ب ٢٨٤٣

مركز دعوة وتوعية الجاليات بأبها وخميس مشيط
تليفون وفاكس ٢٢٤٠٠٣٨ / ٠٧ ص. ب

مكتب توعية الجاليات بالطائف
تليفون ٠٢/٧٣٦٠٨٢٢ ص. ب ٤١٥٥

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بمكة المكرمة
تليفون وفاكس ٥٣٦٠٥٩٤ / ٠٢ ص. ب ٣٧٧٤

مكتب توعية الجاليات بجده حي الحمراء
تليفون فاكس ٠٢/٦٦٥٦٩٩٤ ص. ب ١١٢٠٢ جدة ٢١٤٥٢

المكتب التعاوني لدعوة الجاليات حي مشرفة - جدة
تليفون ٦٧٢١٧٥٤ / ٦٧٣٠٤٣١ / ٠٢
فاكس ٠٢/٦٧٢١١٤٧ ص. ب ١٥٧٩٨ جدة ٢١٤٥٤

مركز الدعوة والإرشاد بتبوك
تليفون ٠٤/٤٢١١٣١٥ فاكس ٤٢١١١٧٠ ص. ب ٣٢٦٧

مكتب توعية الجاليات بالمدينة النبوية
تليفون ٠٤/٨٤٦١٣٩٢ ص. ب ١٠٢٢٩

مكتب توعية الجاليات بعرعر
تليفون ٦٦١٠٥١٢
ص. ب ٨٧٥